মুসলিম বিশ্বে ইয়াহূদী চক্রান্ত
ও
সমাজতন্ত্রের রূপরেখা

আল্লামা আবূ মুহাম্মাদ 'আলীমুদ্দীন (রহ.)

সম্পাদনায়
আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ
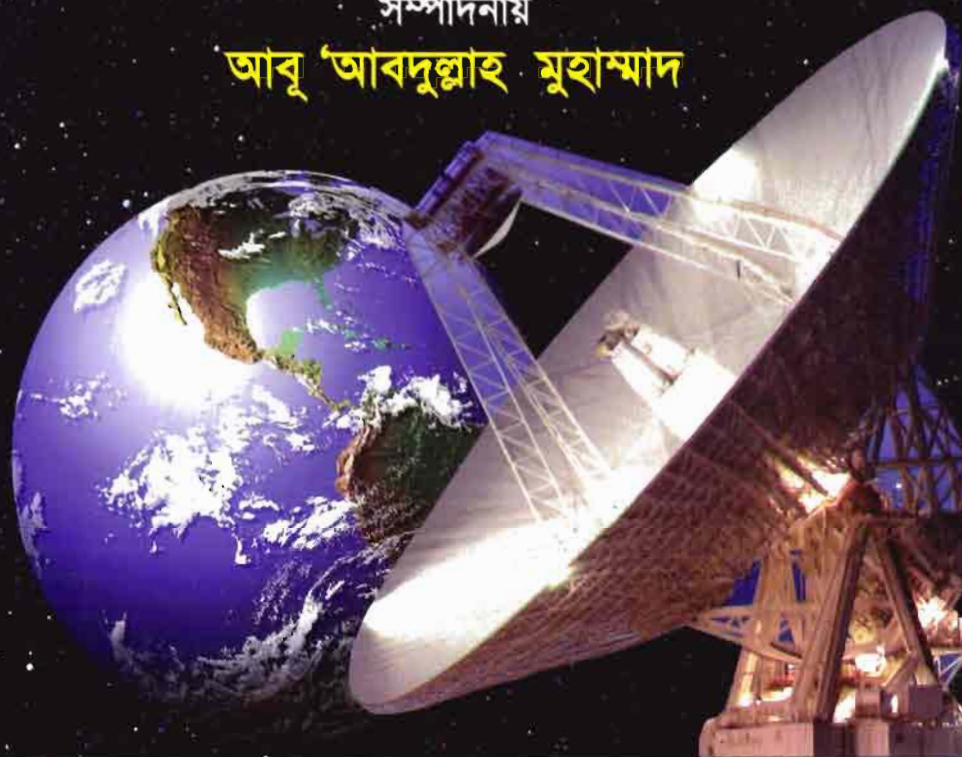
আল্লামা 'আলীমুদ্দীন একাডেমী

MUSLIM BISHSHE EAHOODI CHOKRANTO O SOMAJTONTRER ROOPREKHA

by

Allama Abu Muhammad Alimuddin (Rh)

মুসলিম বিশ্বে ইয়াহূদী চক্রান্ত
ও
সমাজতন্ত্রের রূপরেখা

আল্লামা আবূ মুহাম্মাদ 'আলীমুদ্দীন (রহ.)

সম্পাদনা

আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ

আল্লামা 'আলীমুদ্দীন একাডেমী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নিবেদন

প্রশংসা জগৎসমূহের একমাত্র প্রতিপালক মহান ও মহীয়ান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্য নিবেদিত। আমরা একমাত্র শুধু তাঁরই ইবাদাত করি আর শুধু তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। হিদায়াতের একমাত্র উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় আলোকবর্তিকা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি দরূদ ও সালাম।

২০০১ সালে ১৩ জুন আমাদের শ্রদ্ধেয় পিতা আবূ মুহাম্মাদ 'আলীমুদ্দীন (রহ.) ইন্তিকাল করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি দীনী ইল্‌ম চর্চায় একনিষ্ঠভাবে নিবেদিত প্রাণ ছিলেন।

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ﴾

"হে আমাদের প্রতিপালক! যেদিন হিসাব অনুষ্ঠিত হবে সেদিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং মু'মিনগণকে ক্ষমা কর।" (সূরা ইব্‌রাহীম ১৪ : ৪১)

১৯৭৮ সালে 'মুসলিম বিশ্বে ইয়াহূদী চক্রান্ত ও সমাজতন্ত্রের রূপরেখা' পুস্তিকাটি ইতোপূর্বে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জিলার বহরমপুর শহরস্থ প্রতিভা প্রেস হতে প্রথম মুদ্রিত হয়েছিল। পরবর্তীতে বাংলাদেশে এর মুদ্রণের কোন ব্যবস্থা হয়নি। দীর্ঘদিন পর হলেও গ্রন্থটি পুনরায় প্রকাশ হচ্ছে। এজন্য রাব্বুল 'আলামীনের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শুকরিয়া আদায় করছি।

উল্লেখ্য আমেরিকা ১১ সেপ্টেম্বরের কিছুদিন আগে ইসরাঈল ও আমেরিকার মধ্যেকার উদ্ভট, অস্বাভাবিক, রহস্যময় ও ব্যাখ্যাতীত সম্পর্ক স্পষ্টভাবেই প্রকাশ হয়।

২০০১ সালের আগস্ট মাসে The Durban World Conference on Recism and Recial Discrimination সম্মেলনে ফিলিস্তিন জনগণের উপর নিপীড়নের জন্য ইসলাঈলকে কঠোর সমালোচনা করে। বিশ্বব্যাপী তীব্র নিন্দায় তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। ফলে ইসরাঈল ঐ কনফারেন্স হতে ওয়াকআউট করে। একটি মাত্র দেশ এই ওয়াকআউট-এ সম্পৃক্ত হয় আর তাদের সাথে সংহতিও প্রকাশ করে। আর সে দেশটি ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

আর এ প্রসঙ্গে আমরা আর একটু পিছনে ফিরে যাই : ২০০০ সালে সেপ্টেম্বর মাসে এরিয়েল শ্যারন অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় জেরুজালেমের মাসজিদ আল-আকসায় তার উস্কানীমূলক সফরের পরিকল্পনা করেছিল আর তা ছিল উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও নতুনভাবে আর একটি ইসরাঈলী নিপীড়ন ও নির্যাতনের অধ্যায়ের সূচনা করা।

আর তখন ঐ নিপীড়নের জবাবে আরব মুসলিমগণ আর একটি বেপরওয়া প্রতিরোধের সূচনা করেছিল। শ্যারনের ঐ সফরের এক বছর পর ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের আমেরিকার উপর আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত পৃথিবী দেখেছে কিভাবে ইসরাঈল ফিলিস্তিনীদের উপর ঐ যুদ্ধকে তীব্রতর করার ব্যাপারে ব্যাপক ইন্ধন যুগিয়েছে। কিন্তু বিশ্বের একচ্ছত্র ইয়াহূদী মিডিয়ার বদৌলতে প্রতারণার মাধ্যমে নিজেদেরকে অবিচারের শিকার হিসেবে প্রচার করেছে। কিন্তু সেদিন গোটা পৃথিবী ইসরাঈলের নিপীড়নকে সনাক্ত করেছিল। অপরদিকে গণসংযোগের ক্ষেত্রে ইসরাঈলের জন্য এক বিপর্যয় নেমে এসেছিল। উল্লেখিত কনফারেন্সের মাধ্যমে সেদিন সেই বাস্তব রূঢ় চিত্র পৃথিবীর সামনে উদ্ভাসিত হয়েছিল।

আমেরিকার উপর ১১ সেপ্টেম্বরের আক্রমণ ইসরাঈলের ঐ গণসংযোগ বিপর্যয়কে তৎক্ষণাৎ এবং সম্পূর্ণরূপে এমনভাবে বদলে দিল যে, হঠাৎ করেই আরব তথা মুসলিম বিশ্ব নিজেদের গণসংযোগকে বিপর্যয়ের মুখোমুখী দেখতে পেল যা ছিল কিনা ইসরাঈলের বিপর্যয়ের চেয়ে অনেক বেশী ভয়ানক ও গুরুতর। সেদিন টেলিভিশনের জন্য সত্যিই সার্থকতা লাভ করেছিল ঐ ১১ সেপ্টেম্বরের বদৌলতে, বিশ্বজুড়ে যখন টেলিভিশন কেন্দ্রসমূহ হতে নির্লজ্জভাবে আমেরিকান টেলিভিশন কেন্দ্রের সাথে 'মিডিয়া ক্রুসেডে' যোগ দিল। আর বাস্তব ক্ষেত্রে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে আসলে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ কথাই প্রমাণিত যে, এই হামলার ফলে একমাত্র ইয়াহূদী রাষ্ট্র ইসরাঈল উপকৃত হয়েছে। ঐ আক্রমণের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ইসরাঈলী গোয়েন্দা বাহিনী মোসাদ ও অন্যান্য ইয়াহূদীগণ (যেমন মার্কিন সরকারের কর্মরত ইয়াহূদীগণ) হচ্ছে প্রথম সন্দেহভাজন গোষ্ঠী।

আমেরিকান রাজনীতিবিদ লিন্ডন লারুচ যুক্তি দেখিয়েছেন যে, ১১ সেপ্টেম্বরের মত কোন আক্রমণ চালাতে হলে আমেরিকার সরকারী কাঠামোর অভ্যন্তর থেকে তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন। (লারুচের ওয়েবসাইট দেখুন) আজ দিবালোকের ন্যায় এ কথা অতি স্পষ্ট ও বাস্তব ক্ষেত্রে প্রমাণ হয়ে গেছে যে, এই আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে ইসরাঈল এবং কেবলমাত্র ইসরাঈলই লাভবান হয়েছে। আর দ্বিতীয়তঃ গণসংযোগের বিপর্যয় পাল্টে ইসরাঈলকে নাজুক অবস্থা থেকে মুক্তি দিয়েছে। আর যথেচ্ছা উস্কানী তীব্রতরভাবে আরব ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে নিপীড়ন নির্যাতন ও রক্তাক্ত সংঘাত ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এটাও ইয়াহূদীদের জন্য কম আশাপ্রদ বিষয় ছিল না।

আজ এটা পরিষ্কার যে, ১৯৯১ সালে উপসাগর যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল, ইরাককে পঙ্গু করে দেয়া, যার ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই ইসরাঈল কোন বাধা-বিপত্তি ছাড়াই গোটা ইরাককে যেন গিলে খেতে পারে। আর একমাত্র ঐ লক্ষ্যই স্পষ্টত অর্জিত হয়েছিল।

সবচেয়ে বড় অবাক কাণ্ড বা বলা যায় যে, বড় আশ্চর্যের বিষয়, ঐ টুইন টাওয়ারে প্রায় পাঁচ হাজার ইয়াহূদী কর্মরত ছিল। কিন্তু ঐ দিন অর্থাৎ ১১ সেপ্টেম্বর কোন ইয়াহূদীই কর্মস্থলে উপস্থিত হয়নি। তার কারণ কী? তাহলে এটা কি প্রতীয়মান হচ্ছে না যে, ইয়াহূদী গোয়েন্দা বাহিনী মোসাদ পুরো ঘটনা পূর্ব পরিকল্পনা মাফিক ঘটিয়েছে। আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় যে, ১১ সেপ্টেম্বরের আক্রমণের বিষয়টি মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে এক সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রের নীলনকশা। কারণ এ ঘটনার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ মধ্যপ্রাচ্যসহ অন্যান্য মুসলিম দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা এবং একটা বৃহৎ ইস্যু তৈরী করা যাতে পৃথিবীর অন্যান্য বৃহৎ শক্তিসমূহ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। ঘটনাচক্রে সে অভীষ্ট লক্ষ্যে মার্কিন সরকার সমস্ত মানবিক চেতনাকে নিষ্পেষিত করে আফগানিস্তান ও ইরাকের উপর আক্রমণ অব্যাহত রেখেছে। সত্যিকার অর্থে ১১ সেপ্টেম্বরের পর

থেকে বিশ্বজুড়ে মুসলিমদের উপর অত্যাচার নিপীড়ন নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। মুসলিমগণ এখন সকল পরীক্ষার মধ্য দিয়ে হতাশা ও বিমর্ষ অবস্থায় দিন অতিক্রান্ত করছে।

আর মধ্যপ্রাচ্যসহ গোটা মুসলিম বিশ্বকে দুর্বল ও পঙ্গু করে দেয়ার জন্য মোসাদ বাহিনী গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। এর ফলে ইসরাঈলের সম্প্রসারণবাদের পথ আরও প্রশস্ত হয়। আর শুধু মধ্যপ্রাচ্যই নয়, গোটা বিশ্বে একক ক্ষমতাধর রাষ্ট্র হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করা। ইয়াহূদী চক্রের গভীরে আরও এক ভয়ানক ষড়যন্ত্র নিহিত আছে। মূলতঃ তা পাকিস্তানের পারমাণবিক অস্ত্রাগারের ধ্বংস সাধন এবং ইরানের স্থাপনাগুলোকে অকেজো করে দেয়া। কিন্তু ঐ লক্ষ্য এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। তবে আফগানিস্তানের ইসলামী শক্তির বিলুপ্তি সাধন ও ইরাককে মিথ্যা অজুহাতে চিরতরে গ্রাস করা। এ পর্যন্ত সে লক্ষ্য তাদের সিদ্ধ হয়েছে। আর পরবর্তী পর্যায়ে কি ঘটতে যাচ্ছে তা একমাত্র অদৃশ্যের মালিক আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন সবচেয়ে ভাল জানেন।

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দয়া করুন, আমাদের সাহায্য করুন, আর আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করুন। আর মুসলিম জাতির শত্রুদের চক্রান্ত হতে আমাদের রক্ষা করুন।

আজ মুসলিম জাতির নিকট অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, আমরা শুধু দেখছি, আর শুধু দেখছি। আফগানিস্তান, ইরাক দখলের পর সিরিয়া আর ইরানের প্রতিও ইয়াহূদীদের ক্ষোভ কম নয়। তবু আমরা এসব দেখতেই থাকব। ইরাকের রাস্তায় প্রতিদিন একের পর এক লাশের বহর। দেখতেই থাকব অজস্র অসহায় মা-ভাই-বোনের আর্তচিৎকার আহাজারীতে আকাশ বাতাস স্তম্ভিত। সমগ্র মুসলিম বিশ্ব দেখছে, দেখতেই থাকবে- কোন প্রতিক্রিয়া নেই। প্রতিকারের জন্য কোন চোখ দিয়ে দেখব, সে চোখ যে আজ আমাদের নেই। সে অনুভূতি-সহানুভূতি যেন আজ বিলীন হয়ে গেছে।

ইটালীর বিশিষ্ট পণ্ডিত গবেষক লেডী লরা ভেসিয়া ভ্যাগলিয়েরী তার গ্রন্থে (১৯২৫ খৃঃ) বলেন : "যখন মুসলিম শাসকদের দরবারসমূহ এবং মুসলিম দেশের বিদ্যালয়সমূহ (পৃথিবীর বুকে) বাতিঘরের মত ছিল, তখন ইউরোপ মধ্যযুগীয় অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। তখন মুসলিম দার্শনিকদের চিন্তা এমন উঁচু পর্যায়ে পৌছেছিল যে, তা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের পথপ্রদর্শকের কাজ করেছিল।" (ইসলামের সহজ ব্যাখ্যা ৭৫-৭৬ পৃঃ)

তিনি অন্যত্র আরও বলেন, "খলীফা হারুন-উর-রশীদ বহুবিধ বিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্য মাসজিদ সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। হাজার হাজার বই দ্বারা সমৃদ্ধ পাঠাগারের দুয়ারগুলি মুসলিম বিশ্বের পণ্ডিতদের জন্য অবারিত ছিল। এরপর আমরা কিভাবে বলতে পারি যে, বিগত শতাব্দীসমূহ ইসলাম কৃষ্টির উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করেছিল। বেকনের পরীক্ষণমূলক পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করার আগেই কি আরবরা ঐ পদ্ধতি প্রয়োগ করেননি? রসায়ন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নয়ন বহুবিধ ভৌত আইনের আবিষ্কার– এসব কি আরবদের অবদান নয়?" (ঐ- ৭৬ পৃঃ)

তিনি মুসলিম জাতির ভাগ্যের পরিহাস এভাবেই নির্ণয় করে বর্ণনা করেছেন, "দুর্ভাগ্যবশতঃ ইসলাম ধর্মের নিকট আরবদের সম্পদরাজি থাকা সত্ত্বেও এটা তুর্কী, তাতার ও মঙ্গলদের হাতে পড়ল। আর এ জাতিগোষ্ঠীগুলোকে আরবরা ভাড়াটে সৈনিক হিসাবে নিয়োজিত করেছিল এবং তারা কেবল শুধু অর্থ উপার্জনের জন্য এসেছিল। এরা পরবর্তীকালে বিজয়ী ধর্ম গ্রহণ করল এবং এক সময় ইসলামী বিশ্বের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে দাঁড়ালো। এরা বাহ্যিকভাবে ইসলামী আল-খেল্লা গায়ে চাপালো বটে, কিন্তু ইসলামের গভীরের চেতনাবোধকে অনুধাবন করতে পারল না। ইসলামের অন্তর্নিহিত প্রাণ উজ্জীবিত চেতনায় নিজেদেরকে সত্যিকার অর্থে শিক্ষিত করে তুলতে পারল না। ...... এদের কারণেই মুসলিম বিশ্বের প্রজারা বিজ্ঞানে তাদের আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিল এবং তাদের উপর সহজেই কর্তৃত্ব করা সম্ভব হয়েছিল।

.... এক কথায় বলতে গেলে, এ ব্যক্তিগত লাভ অন্বেষণকারী ও সুবিধাবাদীরা ধর্মকে গ্রহণ করেছিল। সে ধর্মের চরিত্রকে তারা মিথ্যা আবরণে ঢেকে দিল। তারা ধর্মের বহিঃস্থ ক্রিয়াগুলো অনুসরণ করল, ইসলামের গভীরতর আত্মচেতনাকে অনুধাবন করতে পারল না।" (৭৭ পৃঃ)

ইটালীর এই পণ্ডিতের বক্তব্য অনুধাবনযোগ্য। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আমাদেরকে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে উপলব্ধিবোধ উজ্জীবিত করুন। আর এই বিপর্যয়ের মূল কারণ নির্ণয় করতে ও উত্তরণের প্রক্রিয়া সহজ করুন। আর আল্লাহ্ আমাদের মৃত ও মরচে পড়া অন্তরগুলি আবার সজীব করুন।

এ কথা যতই তিক্ত ও অপ্রিয় হোক যা প্রকৃত অর্থে নিরূপিত হচ্ছে যে, বর্তমান মুসলিম বিশ্ব সামগ্রিকভাবে আত্মপরিচিত ও আত্মবিশ্বাসের সুদৃঢ় মজবুত ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে গেছে। মুসলিম বিশ্বের আধুনিক উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণী যাদের হাতে শাসন ক্ষমতা এবং রাজনৈতিক লাগাম রয়েছে তারাই মূলতঃ আজ পথভ্রষ্ট। তারাই জাতিকে সত্যিকার অর্থে বিভ্রান্ত করছে। আজ হতাশা, অদূরদর্শীতা হীনমন্যতা আত্মকেন্দ্রিক মনোবৃত্তি আমাদেরকে দিনের পর দিন নিম্নশ্রেণীতে পরিণত করছে। আমাদের চিন্তা-চেতনা ব্যক্তিকেন্দ্রিক বড়জোর পরিবার ভিত্তিক; ফলে সমাজ ও জাতির মধ্যে উচ্চ চিন্তাধারার কোন প্রতিফলন ঘটছে না। বছরের পর বছর অতিক্রান্ত হচ্ছে, কিন্তু কোন পরিবর্তন নেই। ফলে পরিবেশ ও পরিস্থিতি এমন নিম্ন স্তরে যেয়ে উপনীত হয়েছে যে, সাধারণ মানুষও আজ হতাশাগ্রস্ত। পৃথিবীতে যে জাতি নিরাপত্তা প্রদান করত তারাই আজ চরমভাবে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾

"কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম; সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে লা'নত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।" (সূরা নিসা ৪ : ৯৩)

এ বিষয়ে উপসংহারে উপনীত হয়ে এ প্রশ্ন জাগে যে, এ করুণ পরিণতির কারণ কী? প্রকৃত অর্থে আসমানী দীন যে দীন জিবরীল ('আ.) মারফত দুনিয়াতে এসেছিল, আর হিদায়াতের উজ্জ্বল জ্যোতি নিয়ে যে নাবী ﷺ পৃথিবীতে এসেছিলেন; আর আল্লাহর রাসূল ﷺ মানব জাতির জন্য যে দিক নির্দেশ চিহ্নিত করে গেছেন সে জ্যোতির্ময় পথটি আজ আমরা হারিয়ে ফেলেছি।

আসুন আজ এক আল্লাহ, এক কুরআন, এক নাবী, এক দীন, এক জাতি হিসাবে সেই জ্যোতির্ময় পথটি অন্বেষণ করি। সঠিক দীনকে হাতে দাঁতে আঁকড়ে ধরি। আর আল্লাহর কাছে

সাহায্য ও দয়া ভিক্ষা করি, সকাল সন্ধ্যায় শুধু তাঁর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করি। তবেই আবার মুসলিম জাতি আবার ঘুম থেকে জেগে উঠবে এবং ইয়াহূদীরা তাদের প্রতি ঐ মহান প্রতিপালকের অঙ্গীকার কৃত ঐশ্বরিক শাস্তি লাভ করবে। নিশ্চয়ই ইয়াহূদী রাষ্ট্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। আর তারা যা কিছু সেখানে স্থাপনা করেছে সবকিছুই ধূলায় গড়াবে। সে দিনের প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে আছি।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেন ঃ

﴿إِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾

"এবং আল্লাহ্ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজ অবস্থা নিজে পরিবর্তন করে।" (সূরা রা'দ ১৩ : ১১)

ডিসেম্বর- ২০০৫ ঈসায়ী

আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ
উপ-রেজিস্ট্রার
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

সূচীপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

নাহমাদুহু ওয়ানু সাল্লি 'আলা রাসূলিহিল কারীম; আম্মা বা'দু।

মহান ও মহীয়ান পরম করুণাময় আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের শত কোটি প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার পর শত সহস্র আশীষ বর্ষণ কামনা করি। আর ঐ মহা মনীষীর প্রতি যিনি সৃষ্টির জন্য রহমাত স্বরূপ পৃথিবীর বুকে প্রেরিত হয়েছিলেন সেই শেষ পয়গাম্বর ও রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ যাঁর নীতি ও আদর্শ ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, আরব-অনারব সমগ্র পৃথিবীর সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য সকল বিষয়ে পরিপূর্ণভাবে অনুসরণযোগ্য। বরং মানব জাতির ব্যক্তি জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সকল ক্ষেত্রে শান্তি ও প্রগতির একমাত্র মূল চাবিকাঠি এবং তাঁর পক্ষ হতে প্রাপ্ত দীনই হল মানবতার ধর্ম ও ভ্রাতৃত্বের ধর্ম, শান্তির ধর্ম, আর এই জাতির প্রথম বাহক আরব জাতি তৎকালীন পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম সন্তান ছিলেন। সততায় ও অতিথি সেবায়, প্রতিশ্রুতি রক্ষায় আর্তমানবতার সহযোগিতায় তারা সকল শ্রেণীর মানব গোষ্ঠী অপেক্ষা অগ্রণী ছিলেন।

আল-কুরআনুল হাকীমে মুহাম্মাদ ﷺ-এর আদর্শে এবং তাঁর সাহাবা (রাযি.)-গণের চরিত্রে ও ব্যবহারিক জীবনে যে ন্যায়নীতি ও সততার দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে তা-ই সমগ্র পৃথিবীর মানব জীবনের জন্য সর্বস্তরের শান্তি ও শৃঙ্খলার একমাত্র উপকরণ হয়েছিল।

ইসলাম তার সুমহান আদর্শ নিয়ে সমুদ্র ও নদ-নদী পাহাড়-পর্বত কত জঙ্গল মরুভূমি অতিক্রম করে তেপান্তরের মাঠ ময়দান বয়ে চলেছিল সমগ্র বিশ্বের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য। মনুষ্য সমাজে ভেদাভেদের বাঁধ ভেঙ্গে ধনী-দরিদ্র প্রভু ও দাস সকলকে এক কাতারে সমবেত করেছিল। এরপর নেমে আসল পৃথিবীর বুকে স্রষ্টার অপার করুণা। জগদ্বাসী ধন্য হল শান্তি ও মৈত্রীর অনাবিল পরশে। কিন্তু ন্যায়-নীতির বিরুদ্ধ শত্রুরা ইসলামের এহেন অগ্রগতি তাদের মুরুব্বীগিরীর পথে বাধাস্বরূপ ভেবে তার সন্তানগণকে নানা রকম মুখরোচক ভাষায় পথহারা করার হীন অভিপ্রায়ে গভীরভাবে সম্পৃক্ত হয়ে গেল।

স্রষ্টার সামনে বৈধ-অবৈধ, পাপ-পুণ্য স্বীয় অপকর্মের জবাব দেয়ার বিশ্বাস রহিত করতঃ ভবিষ্যতে এক অনিশ্চয়তার পথে লক্ষ্যহীনভাবে অগ্রসর হতে শুরু করল, যার পরিণাম ফল স্রষ্টার অভিশাপ নেমে আসা এবং জগৎ সংসারে অশান্তির কবলে নিপতিত হয়ে আরও হাহুতাশের মধ্যে পড়ে যাওয়ার পথেই আর ক্রমশঃ চলেছে। দিনের পর দিন এর ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে তারা আদৌ অবগত নয়। এ লক্ষ্যভ্রষ্ট রাজনীতি যা জাতিকে প্রকৃত প্রগতি ও শান্তি হতে অবক্ষয়ের গহ্বরে ক্রমান্বয়ে নিক্ষেপ করল এবং সাম্যতার নামে মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের পথ দ্রুত কিভাবে অবরুদ্ধ হচ্ছে তারই রূপরেখা যৎকিঞ্চিৎ এখানে বর্ণনা হয়েছে এবং ইসলাম যে ন্যায় ও সততা প্রতিষ্ঠার শিক্ষা দিল; যার পরিণাম কত মধুর ও স্থায়ী শান্তি তার বর্ণনা করা হয়েছে। যদি এর দ্বারা কোনও মানুষের সুমতি ফিরে আসে শুধু এ প্রত্যাশায়।

ওয়াস্‌সালামু আলা মানিত্‌তাবাআল হুদা।

আবূ মুহাম্মাদ 'আলীমুদ্দীন

পূর্বাভাস

'ইসলামে বিভিন্ন দল ও উহার উৎস' (ফিরকাবন্দীর মূল উৎস) প্রথম খণ্ডের মধ্যে ইয়াহূদীদের ষড়যন্ত্র ঐ সাথে অন্যান্য জাতির বিভিন্ন চক্রান্ত ইসলামের বিরুদ্ধে উল্লেখিত হয়েছে। গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে দীর্ঘ ৩৪ পৃষ্ঠা এদের ষড়যন্ত্র মুসলিম সমাজে তার প্রতিক্রিয়া ও দলাদলি– ভাই ভাইয়ে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি– এমনকি 'আকীদার দিক দিয়ে শতধাবিচ্ছিন্ন হওয়ার কথাগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

তাদের পক্ষ হতে যে ষড়যন্ত্রের জাল প্রসারিত হয়েছে তার মুখ্য উদ্দেশ্য মুসলিম জাহানে রাজনৈতিক চিন্তাধারা এবং ইসলামী 'আকীদাহ্ সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি। কারণ পৃথিবীর বিভিন্ন ইসলাম বিরোধী শত্রুদল ইসলাম সম্পর্কে বুঝিয়েছে যে, ইসলাম ও মুসলিম জাতি খাঁটিভাবে আসমানী দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকলে পৃথিবীতে কোন শক্তিই ইসলাম ও মুসলিম জাতির মোকাবিলায় টিকতে পারবে না। সুতরাং যখনই এদের ইসলামকে বিকৃত করা হবে তখন তারাও অন্যান্যদের ন্যায় গলৎ-এ ডুবে যাবে। সুতরাং ঐ গলদ ইসলাম তাদের সমাজের সন্তানদের উপর কোন প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া বিস্তার লাভ করতে পারবে না।

যেহেতু ঐরূপ ক্ষেত্রে ইসলামে অন্য ধর্ম হতে আর পৃথক বৈশিষ্ট্যের কোন মর্যাদা থাকবে না ফলে অন্যান্যরাও আর আকৃষ্ট হবে না। আর মুসলিম জাতি যখনই 'আকীদাহ ও রাজনৈতিক ব্যাপারে শতধাবিচ্ছিন্ন হবে তখন তাদের রাষ্ট্রীয় শক্তি দুর্বল হতে দুর্বলতর হয়ে পড়বে। ফলে তাদের উপর ঐ ষড়যন্ত্রকারী কূচক্রীদের প্রাধান্য বিস্তারের পথ খুলে যাবে। এর মূল

কারণ এদের সংসারের চাকচিক্য ও সুখ-সুবিধার প্রতি অত্যধিক মোহ ও তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

যেমন আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেছেন :

﴿وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوٰةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾

"তুমি নিশ্চয় তাদেরকে জীবনের প্রতি সমস্ত মানুষ, এমনকি মুশরিক অপেক্ষা অধিক লোভী দেখতে পাবে। তাদের প্রত্যেকে আকাঙ্ক্ষা করে যদি হাজার বৎসর আয়ু দেয়া হতো; কিন্তু দীর্ঘায়ু তাকে শাস্তি হতে দূরে রাখতে পারবে না। তারা যা করে আল্লাহ তার দ্রষ্টা।" (সূরা বাকারাহ্ ২ : ৯৬)

আর এই সম্প্রদায়কে তুমি পাবে যে, তারা অন্যান্য লোক অপেক্ষা পার্থিব দুনিয়ার প্রতি আসক্ত। এদের প্রত্যেকেই হাজার বৎসরকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকতে কামনা করে। এর কারণ স্বরূপ কুরআনে উল্লেখ হয়েছে যে, এরা নিজেরা স্বেচ্ছাচারনুযায়ী জীবন যাপনে এরূপ অভ্যস্ত হয়েছে যে, সৎ নীতি, সৎ আদর্শ, ন্যায়পরায়ণতা, সুবিচার সবকিছুই পার্থিব জীবনের প্রলোভনে জলাঞ্জলী দিয়েছে। এদের সমাজ ব্যবস্থা এরূপ দুর্নীতি ও কুটিলতায় পরিপূর্ণ যে, এরা অন্যের চোখে পট্টি দিয়ে নিজেরা সুখ-সুবিধা ভোগ করার ক্ষেত্রে বড়ই ধুরন্দর-চালাক। তাই এরা নিজেদের ত্রুটিগুলি অন্যদেরকে বুঝতে দেয় না এবং অন্যান্যদেরকে বলদ বানিয়ে প্রভুত্ব করার জন্য তাদের সম্পর্কে কুম্ভিরাশ্রু বর্ষণ করে আর যেন তাদের কতই না একান্ত হিতাকাঙ্ক্ষী। এরা তাদেরকে আপাত মধুর মনোরঞ্জনমূলক কথায় ভুলিয়ে রাখত এবং নিজেরা ঐ অনুর্বর মস্তিষ্কওয়ালাদের উপর নেতৃত্ব করত। তাই বাহ্যতঃ দৃষ্টিতে এদের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী সাজত আর তা ছিল নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখার স্বার্থে।

মুসলিম জাতির রাজনীতি ও ইয়াহূদী চক্রান্ত

আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন :

﴿مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَّرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِى الدِّيْنِ﴾

"ইয়াহূদীদের মধ্যে কতক লোক কথাগুলো স্থানচ্যুত করে বিকৃত করে এবং বলে, 'শ্রবণ করলাম ও অমান্য করলাম' এবং শোনা না শোনার মত; আর নিজেদের জিহ্বা কুঞ্চিত করে এবং দীনের প্রতি তাচ্ছিল্য করে বলে, 'রাইনা'* ।" (সূরা আন্ নিসা ৪ : ৪৬)

ইয়াহূদীদের ধূর্তামী নীতির মুখোশ যারা খুলে দিত এবং ওদের সঠিক পথে চলতে বলত তাদেরকে এই ইয়াহূদী সমাজ হত্যা করত। এ ধরনের আয়াত : আল বাকারাহ্, আ-লি 'ইমরান, আন্ নিসা, মায়িদাহ্ ও বানী ইসরাঈল সূরাগুলোর বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ হয়েছে। এদের নৈতিক অধঃপতন এরূপ পর্যায়ে পৌঁছে যে, প্রতিপক্ষের অর্থ ও ধন-সম্পদ ছলচাতুরী বশতঃ হস্তগত করা এবং এরা ভাষা ও শব্দের হের-ফেরে অন্যায়কে ন্যায় সাব্যস্ত করার জন্য সদা প্রস্তুত থাকত। গুপ্ত-হত্যার মাধ্যমে মানুষের ন্যায্য সম্পদ হতে বেদখল করা, অন্যায় কাজের প্রতি একে অপরকে শক্তি দিয়ে সাহায্য করাই ছিল এদের প্রকৃত জাতস্বভাব।

---

* 'রাইনা' مراعاة হতে উদ্গত; رعى অর্থ অন্যকে রক্ষা করা বা দেখাশুনা করা। মু'মিনগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে কথোপকথনের সময় এ শব্দ ব্যবহার করত। অর্থ- 'আমাদের দিকে লক্ষ্য করুন ও ধীরে বলুন।' এ শব্দটি ইয়াহূদীদের ভাষায় 'ভর্ৎসনা' অর্থে ব্যবহৃত হত। رعونة হতে নির্গত অর্থে- 'হে বোকা'। মু'মিনগণকে এ শব্দ ব্যবহার করতে দেখে তারাও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এটা ব্যবহার করে পরস্পরের মধ্যে হাসি-ঠাট্টা করত।

আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন :

﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهٖ إِلَيْكَ وَ
مِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهٖ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ
قَائِمًا ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيّٖنَ سَبِيلٌ
وَيَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾

"কিতাবীদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে, যে বিপুল সম্পদ আমানাত রাখলেও ফেরত দিবে; আবার এমন লোকও আছে যার নিকট একটি দীনারও আমানাত রাখলে তার পিছনে লেগে না থাকলে সে ফেরত দিবে না, এটা এই কারণে যে, তারা বলে, 'নিরক্ষরদের* প্রতি আমাদের কোন বাধ্যবাধকতা নেই', এবং তারা জেনে শুনে আল্লাহর সম্পর্কে মিথ্যা বলে।"

(সূরা আ-লি 'ইমরান ৩ : ৭৫)

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অপর আয়াতে বলেন :

﴿وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَّلْوٗنَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتٰبِ لِتَحْسَبُوْهُ
مِنَ الْكِتٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا
هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ﴾

"আর নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে একদল লোক আছেই যারা কিতাবকে জিহ্বা দ্বারা বিকৃত করে যাতে তোমরা তাকে আল্লাহর কিতাবের অংশ মনে কর; কিন্তু তা কিতাবের অংশ নয় এবং তারা বলে, 'তা আল্লাহর পক্ষ হতে'; কিন্তু তা আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত নয়।"

(সূরা আ-লি 'ইমরান ৩ : ৭৮)

---

* ইয়াহূদীদের বিশ্বাস মতে আরবরা মূর্খ ও ধর্মহীন, কাজেই আরবদের অর্থ আত্মসাৎ করা ইয়াহূদীদের জন্য বৈধ।

উল্লেখ্য এখানে এ কথাই প্রতীয়মান যে, ন্যায় কথার বিকৃত ব্যাখ্যা করা, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা, মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডা দ্বারা অপরকে বিভ্রান্ত করা এদের নীতি-নৈতিকতার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং বিভ্রান্তিমূলক কথাবার্তা এবং মানুষকে বিভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করা ইয়াহূদীদের স্বভাবজাত ধর্ম। তাই এদের উপর তলার লোকগুলো মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে নানাবিধ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকত। জাতির মধ্যে রাষ্ট্রীয় কোন্দল সৃষ্টি করা এদের প্রধান উদ্দেশ্য যেহেতু ইবলীসের যে কাজ মূলতঃ তা-ই এদের কাজ। এতেই এদের আনন্দ ও তৃপ্তি! মানুষকে বিশেষ করে মুসলিম রাজ্যের মধ্য অশান্তি লাগিয়ে তাদের ধর্ম ও চরিত্র নষ্ট করায় হচ্ছে এই ইবলিসী দলের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

খোলাফায়ে রাশেদার প্রথম দুই যুগে এরা মোটেই সুবিধা করতে পারেনি। ‘উসমান ও ‘আলী (রাযি.)-এর যুগে যখন মানুষ সংসার ও নেতৃত্বের মোহে ক্রমান্বয়ে আবিষ্ট হল; তখন এরা শাসক ও প্রজাগণের মধ্যে গোলযোগ সৃষ্টি করত; মুসলিম প্রশাসন যন্ত্র তছনছ করার পিছনে উঠে পড়ে লাগে। আর ‘আকীদার দিক দিয়ে মুসলিম জাতিকে দ্বিধা-বিভক্ত করার জঘন্য ষড়যন্ত্র ও আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। তারপর দলাদলি, একে অপরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে নিজেদেরকে ক্রীড়ানক হওয়ার উপযুক্ত পাত্র হিসেবে অবুঝ যুব সম্প্রদায়কে দিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ খাড়া করিয়েছে।

শয়তান তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও মনোমালিন্যতার বীজ বপন করে। কিন্তু তোমরাও শয়তানের কথায় বেশী অনুসরণ কর। মাত্র অল্প সংখ্যক ছাড়া প্রায় ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের পথ অবলম্বন করে।

আর আজ মুসলিম জাতি শতধাবিচ্ছিন্ন- বিশেষ করে রাজনৈতিক চিন্তাধারায় জাতি আজ ব্যাপক গরমিলের শেষপ্রান্তে উপনীত।

শী'আ সম্প্রদায় এবং উহাদের মূল উৎসের স্বরূপ

মুসলিম জাতির সূচনালগ্নের ইতিহাস ও ইতিহাসের পিছনে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে, হিজরীর ৩৫ সনে 'উসমান (রাযি.)-এর শাহাদতের পর 'আলী (রাযি.)-এর বাই'আত সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে মুসলিম জাতির মধ্যে যে দলীয় কোন্দল ও ঘরোয়া বিবাদের সূত্রপাত হয়। আর ঐ সময় মুসলিম সমাজে দলীয় কোন্দলের ইন্ধন যোগানোর এবং জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট করার জন্য যে দুষ্ট শ্রেণীর লোক ইসলামে অনুপ্রবেশ করে তাদের অধিকাংশ অগ্নিপূজক ও ইয়ামানের ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের লোক ছিল। 'আলী (রাযি.)-এর সাথে জামাল যুদ্ধে, সিফফীনের যুদ্ধে যে সমস্ত সাহাবাবর্গ ছিলেন তাঁরা ঐ যুদ্ধে 'আলী (রাযি.)-এর দলভুক্ত হয়েছিলেন। আর 'উসমান (রাযি.) সম্পর্কে তাদের কোনরূপ বিরূপ মতবাদ ছিল না যে, তিনি খিলাফতের যোগ্য ছিলেন না অথবা অন্যান্য সাহাবাগণ তাকে অন্যায়ভাবে খলীফা নির্বাচন করেছিলেন এবং 'আলী (রাযি.) আবূ বাক্‌র, 'উমার, 'উসমান (রাযি.) হতে বর্ণিত খিলাফতের অধিক হকদার এ কথা কোন মু'মিনই সে যুগে এ বিষয়ে পৃথক মত পোষণ করতেন না, কিন্তু পরবর্তী যুগে ইসলামে অনুপ্রবেশকারীগণ মুসলিম সম্প্রদায়ের 'আকীদা, সাহাবাগণ (রাযি.) সম্পর্কে এবং তাওহীদী 'আকীদায় বিভেদ সৃষ্টি করার লক্ষ্য ও উদ্দেশে বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করে এক কুহেলিকার সৃষ্টি করেছে। ফলে এরা কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীর মতে 'আলী (রাযি.) হচ্ছেন স্বয়ং খোদা। এরা 'আলী (রাযি.)-এর আমলেই অধিকাংশ আত্মপ্রকাশ করে।

'আলী (রাযি.) এদের মুখচেনা পাণ্ডাগুলোকে ধরে আগুনে পুড়িয়ে মারেন। কিন্তু আবর্জনা তখন শেষ হয়নি। এ দলের সদস্যরা যুগ যুগ ধরে এ ধরনের বিভ্রান্তিমূলক কথা প্রচার করে আসছিল। সে সময় মুশরিকদেরকে বুঝানোর জন্য এরা বলেছিল যে, 'আলী হলেন বিষ্ণুর দশম অবতার। এরা 'আলীর নামে একখানা কিতাব রচনা করে নেয়। তার নাম রাখা হয় মাহদী পুরাণ। আর তাতে উমাচারী বুদ্ধমতকে দিয়ে এমন

কতগুলো শ্লোক, মন্ত্র ও টীকা লিখানো হয় যা সাধারণের বোধগম্য ছিল না। আর উদ্দেশ্য ছিল বৌদ্ধ ও হিন্দুদেরকে এটা গ্রহণে আগ্রহী করা।

T.W. Arnold নামক ইংরেজ লেখক Preaching of Islam নামক পুস্তকে এ তথ্যগুলো পরিবেশন করেছেন যা নির্ভরযোগ্য ইতিহাস 'হাকীকাতনুমা' গ্রন্থে ২০৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হয়েছে। এরা যখন সিরিয়ার খৃষ্টান সম্প্রদায় মুসলিমদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য নিজেদের দলে ভিড়ানোর চেষ্টা করে তখন প্রকাশ করে যে, 'ঈসা ('আ.) তাঁর পরে যে মহাপুরুষের আগমন বার্তা জানিয়ে ছিলেন খৃষ্টানরা যাকে 'ফারাক্লিত' নামে পরিচিত করে থাকে- 'আলীর মধ্যে সে ফারাক্লিতের রুহ্ বিরাজমান ছিল। 'রাফেজী মজুসীরা' যেহেতু নূরের পূজারী, তাই যার পূজা হয় সে 'আলী স্বয়ং নূর– এ বাহানা করে এক পুঁথি রচনা করে বসে যার নাম যুলমাতনামা*। যুলমাত দেশ দেও-দানব, শয়তানের বসবাসের স্থান। 'আলী স্বয়ং নূর বা খোদা হিসাবে উক্ত যুলমাত বিজয় করেন।

অপর দলের মতে 'আলী (রাযি.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রিসালাতের অংশীদার। 'আলীর নিকট এমন অনেক গোপন 'ইল্ম বা তথ্য ছিল যা রাসূল ﷺ কেবলমাত্র তাকে দিয়ে গেছেন। এ সংবাদ প্রমাণ করার জন্য তারা নিম্নের অলীক তথ্য রচনা করেছে।

عن ابي ذر مرفوعا : خلقت انا وعلى من نور اللالى المصنوعة في الاحاديث الموضوعة صـ ٢٢٠ الجزء الاول، من رواية جعفر بن احمد بن على بن بيان ابي الفضل المصري الشيعي.

"আমি ও 'আলী একই নূরে সৃজিত হয়েছি"। এ হাদীসটি জাফর ইবনে আহমাদ ইবনে 'আলী নামক ব্যক্তির প্রস্তুতকৃত। এ লোকটি ছিল

---

* এটা হিন্দু শাস্ত্র ও অলীক কাহিনীর ন্যায় যে, স্বয়ং ভগবান প্রল্লাহদ নাম ধারণ করে দানব ধ্বংসের জন্য এবং রাম নাম অবতার রূপে রাক্ষস বংশে ধরার বুকে অসার কিচ্ছার ন্যায়।

মিসরের অধিবাসী-শী'আ সম্প্রদায়ের বড়ই বেহায়া ব্যক্তি। এ ঘটনার মূল তত্ত্ব আছে। তারা বলতে চায় যে, 'আলীর মাধ্যমেই মূল তত্ত্বকথা পাওয়া যাবে। যেমন হারূন ('আ.) মূসা ('আ.)-এর নুবূওয়াতের অংশীদার ছিলেন। এ হিসেবে রাসূল ﷺ -এর সমস্ত গোপন কথা তার নিকট বা মাধ্যমে বলেছেন। তারা এ প্রসঙ্গে কুরআন চল্লিশ পারা বলে দাবী করে তন্মধ্যে দশ পারা 'আলীর নিকট ওয়াহী হয় অথবা রাসূল ﷺ তাকে দিয়ে যান। এ সুবাদে তারা একটি হাদীস বানিয়েছে যা বহুল প্রচারিত।

انا مدينة العلم وعلى بابها، فمن اراد المدينة فليات الباب.

আমি 'ইল্‌মের শহর, 'আলী তার দরজা। অতএব 'ইল্‌মের ঘরে প্রবেশ করতে চাইলে প্রবেশপ্রার্থী যেন দরজায় এসে পৌঁছায়। অর্থাৎ 'আলীর মাধ্যমে তা অর্জন করে এবং উক্ত 'ইল্‌ম কেবলমাত্র 'আলীর ভক্ত শী'আদের নিকটই আছে। এ হাদীস সম্পর্কে হাদীসশাস্ত্রের পণ্ডিতগণ মন্তব্য করেছেন :

قال الامام يحى بن معين كذب، قال ابو زرعة : كم من خلق افضحوا فيه، قال امير المؤمنين في الحديث وامام المسلمين في الدين الامام البخاري رحمه الله تعالى : ليس له وجه صحيح، وقال الامام الترمذي : منكر، قال الناقد الذهبي : في ترجمة عمر ابن اسماعيل بن مجالد بن سعيد سرقه من ابن ابي الصلت كذبه ابن معين صـ ٣٥ الجزء الثاني ميزان الاعتدال.

ইমাম ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে মা'ঈন (রহ.) বলেন : এটা বানোয়াট মিথ্যা কথা। ইমাম আবূ যুর'আহ্ রাযী (রহ.) বলেছেন : কত মানুষ তার কারণে বিপাকে পড়েছে। ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন : তার কোনও সঠিক সূত্রই নেই। ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলেন : তা প্রত্যাখ্যাত কথা। ইমাম যাহাবী (রহ.) বলেছেন : তারা অধিক সূত্র সরবরাহ করার ধোঁকায় পড়ে গেছে।

(মীযানুল ই'তিদাল ২য় খণ্ড, ৩৫ পৃষ্ঠা)

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ্ (রহ.) বলেছেন :

الشيعية لما حدثوا يكن الذي ابتدع التشيع قصده الدين : بل كان غرضه فاسداً، وقد قيل انه كان منافقا زنديقا فاصل بدعتهم مبنية الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكذيب الاحاديث الصحيحة مجموع فتاوى شيخ الاسلام الامام ابن تيمية رحمه الله الجز الثالث عشر صـ ٣١.

যে ব্যক্তি শী'আ মতবাদের আবিষ্কার করেছে, তার ধর্মীয় মনোভাবের ভিত্তি আদৌ ছিল না, বরং তার উদ্দেশ্য বড়ই অসৎ ছিল। বলা হয়, সে যিনদীক ও মুনাফিক ছিল, পরে ইসলাম স্বীকার করে তলে তলে কুফরী মত প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল। এদের মাযহাবের ভিত্তি হল মিথ্যা কথার উপর। অর্থাৎ নাবী ﷺ-এর নাম দিয়ে মিথ্যা কথা শরী'আতের বাণী বলে প্রচার করা এবং সহীহ্ হাদীস সমূহকে অস্বীকার করা।

(মাজমুআ-আল ফাতাওয়া, ১৩ খণ্ড-৩১ পৃষ্ঠা)

শী'আদের বদনীতির মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক নীতি হল, ব্যক্তি বিশেষকে বাড়াতে বাড়াতে এতদূর পৌঁছানো যে, যেন তারা আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে এজেন্ট বা মাধ্যম স্বরূপ। তাই এরা এদের বুযুর্গ নামীয় শ্রেণীকে এমন সব উপাধিতে উল্লেখ করে যা কেবল অতিরঞ্জিতই নয়, বরং ইসলামী রীতির বহির্ভূত। যাতে জনগণ আল্লাহ খালেকের 'ইবাদাতের সাথে এদের প্রতিও এমন শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে যেন এরাই পৃথিবীর সবকিছুর মালিক। এ পরিপ্রেক্ষিতে শী'আরা তাদের ধর্মীয় নেতাদেরকে বাবুল্লাহ্, হুজ্জাতুল্লাহ, আয়াতুল্লাহ্ ইত্যাদি খেতাবে ভূষিত করে অর্থাৎ আল্লাহর নিকট পৌঁছানোর জন্য এরাই সোপান স্বরূপ। আল্লাহ্ তা'আলাকে পাবার জন্য এদের দরজায় ধর্ণা দিতে হবে, তবে পরিত্রাণ পাওয়া; হক, না হক পথের সবকিছুর এরাই মাধ্যম; এমনকি জগতের সবাই এদের মুখাপেক্ষী, তাই এদের কতিপয় লোককে এরা গাউস উপাধী দেয় আবার কাউকে কুতুব বলে থাকে।

শী'আদের অনুকরণে বা নিজেদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার আসনে বসাবার জন্য আহলে সুন্নাত নামধারী এ দেশের একদল মুকাল্লিদ শ্রেণী ও সুফী সম্প্রদায়রা বিশেষ বিশেষ লোকজনকে গাউস কুতুব আখ্যা দিয়ে থাকে। গাউস শব্দের যে ব্যাখ্যা : তা মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন ব্যতীত অন্য কারও প্রতি প্রযোজ্য হয় না। শরী'আতের ভাষায় কুরআন হাদীসে বা সাহাবা তাবেঈনদের কাউকেই ঐ শব্দ বলা হত না। কুরআন বা হাদীসে নববীতে উহার কোন নির্ভরযোগ্য সূত্রের কোন প্রমাণ নেই। এ সম্পর্কে ধোঁকা দেয়ার জন্য গাউস, কুতুব নামে যে হাদীসের অবতারণা করা হয় উহা একেবারেই মিথ্যা, বানোয়াট। যা হোক, শী'আরা মুসলিমদের 'আকীদা বিভ্রান্ত করার জন্য বিভিন্ন কথা জাল করেছে এবং হাদীসের নামে এমনভাবে ঢুকিয়ে দিয়েছে যার ফলে সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, অনেক 'আলিমও এ ধোঁকায় নিপতিত হচ্ছে।

খারিজীদের আবির্ভাব

হিজরী ৩৬ সালের জমাদিউস্ সানী মাসে জামাল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ভুল বুঝাবুঝির উপর সংঘটিত এ যুদ্ধের অব্যবহিত পরপর উভয় পক্ষ 'আলী (রাযি.) ও 'আয়িশাহ্ (রাযি.)-এর মধ্যে সমঝোতা হয় এবং তাঁরা উভয়েই এ দুর্ঘটনার জন্য অনুতাপ প্রকাশ করেন। মা 'আয়িশাহ্ (রাযি.)-কে বসরার ৪০ জন রমণী সমভিব্যবহারে মাদীনায় প্রেরণ করা হয়।

এ দুর্ঘটনার পরপরই ঘটে যায় সে মর্মান্তিক ঘটনা যা সিফফীনের যুদ্ধ নামে পরিচিত। জামাল যুদ্ধের ছয়মাস পরেই এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এটা ছিল হিজরী ৩৭ সনের মুহাররম মাসের ঘটনা, যা সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী স্থানে মর্মান্তিকভাবে ঘটে যায়। উভয় দলের মধ্যে যখন কোনও সুষ্ঠু সমাধান হল না, তখন 'আলী (রাযি.) ইরাক চলে আসেন। জামাল যুদ্ধ পরাজিতদের মাল যখন লুণ্ঠনের সুযোগ পাওয়া গেল না এবং তাদের আহত ব্যক্তিগণকে সদয় ব্যবহারের সাথে সেবা শুশ্রুষা করা হল। সর্বোপরি তাদেরকে নিজ নিজ গৃহে পৌঁছানো হল। নিজেদের পিপাসা নিবৃত্ত না

হওয়াতে 'আলীর (রাযি.) দলের অনুপ্রবেশকারী ষড়যন্ত্রকারীরা তাঁর নিকট হতে পৃথক হয়ে গেল। তখন এদের ভ্রান্ত ধারণা অপনোদনের জন্য ইবনে আব্বাস (রাযি.) তাদের নিকট উপস্থিত হয়ে গলৎ ধারণার অমূলক যুক্তি খণ্ডন করলেন। ফলে প্ররোচনায় পড়ে যারা ঐ দলে ভিড়েছিল তারা সাধারণ মুসলিম সমাজে মিশে গেল।

অবশিষ্ট মূল ষড়যন্ত্রকারীরা তাদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সাঙ্গপাঙ্গ সহকারে পৃথক ভাবে থেকে গেল। অতএব 'আলী (রাযি.) হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় তারা আরবী খারিজ শব্দের বহুবচন 'খাওয়ারিজ' নামে পরিচিত হয়ে গেল। তৎকালীন মুসলিমদের বিরুদ্ধে শত্রুতা সাধনে এরা ছিল অগ্রগামী। তারা 'উসমান (রাযি.) ও 'আলী (রাযি.) সহ সাময়িক সকল সাহাবী এবং তাঁদের অনুসারীগণকে কাফির বলত। এরা ইসলামে সর্বপ্রথম বিদআতী দল* এদের বক্তব্যের মধ্যে ছিল।

المؤمن هو البر التقى فمن لم يكن براتقيا فهوا كافر مخلد في النار.

মু'মিন হবে নিখুঁত খাঁটি। যে ব্যক্তি ঐরূপ না হবে সে কাফির-চিরজাহান্নামী। যেহেতু ঈমান শাখাবিশিষ্ট বস্তু নয়, তাই কোন মানুষ মু'মিন হওয়ার পর তার মধ্যে ঈমানের বিপরীত কোনরূপ কাজ পাওয়া গেলে সে মু'মিন থাকবে না। এটা মুসলিম সমাজের সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেয়ার জন্য তাদের আর একটি বাহানা ছিল।

এরা মুসলিমদের গ্রাম লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ ও নরহত্যা করার ন্যায় কর্মকাণ্ড আরম্ভ করেছিল। সাহাবী 'আবদুল্লাহ ইবনে খাব্বাব (রাযি.)-কে হত্যা করে তার আসন্ন প্রসবা স্ত্রীর পেট চিরে সন্তান বের করে আছড়ে মারে। মুসলিম সমাজের উপর সীমাহীন জিঘাংসা চরিতার্থ করার জন্য এ সমস্ত কাজ করত। এদের এ সম্পর্কীয় দুষ্কর্মের শাস্তি প্রদানের জন্য 'আলী

---

* এটা ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত অর্থাৎ সাহাবাগণের (রাযি.) বিরুদ্ধে এক ধর্মীয় অভিযান। তারা এ ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করার পিছনে ছিল। উহা ইয়াহূদী, মজুসী ও খৃষ্টানদের সম্মিলিত চক্রান্তকারীর একটি দল।

(রাযি.) ইরাক প্রদেশের বাগদাদ ও ওয়াসিত-এর মধ্যে 'নাহরোয়ান' নামক স্থানে পৌঁছান। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধে খাওয়ারিজ দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা অধিকাংশ মারা যায়। অবশিষ্ট লোকেরা জনসমুদ্রে মিশে 'আলী (রাযি.)-এর প্রাণ নাশের জন্য উঠে পড়ে লাগে। এছাড়া উগ্রপন্থী কিন্তু চতুর ও বিচক্ষণ লোকেরা গা ঢাকা দেয়া অবস্থায় মুসলিমদের সাথে মিশে ভিতর ও বাহির হতে ইসলাম বিরোধী ব্যাপক বিধ্বংসী তৎপরতা চালায়।

উভয় দল মাঝে মাঝে কুফার গুপ্ত স্থানে সভা সমিতি করে নাহরোয়ানে নিহত সঙ্গীদের জন্য শোক প্রকাশ করত– (দেখুন, আল্ ওয়াসিম মিনাল কাওয়াসিম-এর টীকা)। এদের ষড়যন্ত্র ও ঝগড়ার ফলে সংঘটিত হয় 'আলীর (রাযি.) হত্যাকাণ্ড। এদের আবির্ভাব ও কার্যকলাপ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বিভিন্ন সূত্রে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ্ (রহ.), ইমাম আহমাদ (রহ.)-এর সূত্রে উল্লেখ করেছেন, খারেজীদের সম্পর্কে বর্ণনা সম্বলিত হাদীসগুলির সূত্র দশটির মত।

খারিজী দলের কথা উল্লেখ করার পর এবার দলপতিদের পরিচয় নিম্নে পেশ করা হচ্ছে। খাওয়ারেজদের মতে, চির তাওহীদপন্থী ব্যক্তির দ্বারা কিছু গোনাহের কাজ সংঘটিত হয়ে গেলে সে চির জাহান্নামী বলে গণ্য হবে। এরা হাদীস বলে কিছু মানতে চাইত না।

কুরআন মাজীদের অংশবিশেষের মন্তব্যকে কেন্দ্র করে এবং অন্যান্য আয়াতের সাথে তার সামঞ্জস্যের চিন্তা না করে সাধারণ জনগণকে বিভ্রান্ত করার মানসে যখন যা ইচ্ছা মন্তব্য পেশ করে মূর্খ সমাজের মধ্যে ইসলামী প্রশাসন যন্ত্রকে বাতিল করার জন্য সর্বদর্শীরূপে সর্বমুখী কল্যাণের নেতা নিজেদের হিসেবে আত্মপ্রকাশ করত। পরবর্তীকালে এ খারিজীদের শাখা হিসেবে মুতাযিলা নামে এক ফিরকার আবির্ভাব হয়। মুতাযিলারা অনেক বিষয়ে খাওয়ারিজদের অনুসারী।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) বলেছেন :

قالت الخوارج والمعتزلة : قد علمنا يقينا ان الاعمال من الايمان، فمن تركها فقد ترك بعض الايمان واذا زال بعض زال جميعه، لان الايمان لا يتبعض، ولا يكون في العبد ايمان ونفاق فيكون اصحاب الذنوب مخلدين في النار، اذ ليس معهم من الايمان شئ، الجزء الثالث عشر من مجموع فتاوى شيخ الاسلام الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى.

খাওয়ারিজ ও মুতাযিলা উভয়ের বক্তব্য হল : "আমরা নিশ্চিতরূপে স্বীকার করছি যে, ধর্মীয় অনুশাসনগুলো সমস্তই ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। অতএব যখন ধর্মীয় অনুশাসনগুলির কিয়দংশ ছেড়ে দেয়া হল তখন ঈমানের কিছু অংশ চলে গেল। অতএব যখন কিছু অংশ নষ্ট হল তখন তার ঈমান সম্পূর্ণভাবে চলে গেল। যেহেতু ঈমান অংশযুক্ত বস্তু নয়; তার কিছু অংশ পরিত্যাগ করলে অন্যান্য অংশগুলো পালন সত্ত্বেও সে মু'মিন থাকবে না, কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে; বিধায় তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ বৈধ হবে"। মুতাযিলাদের মতে সে মু'মিনও নয়, কাফিরও নয়। এ মাসআলায় মুতাযিলাদের সাথে খারিজীর মতপার্থক্য হয়েছে।

ইয়াহূদী, শী'আ, মাজূসী ও খৃষ্টানদের সমন্বয়ে ইসলাম বিরোধী এক কুচক্রী পাপী গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। আর এই সম্প্রদায় পরবর্তীতে ইসলামের অবিকল চেহারা বিনষ্ট করার চেষ্টায় গভীরভাবে তৎপর থেকেছে। বিভিন্ন প্রকার ষড়যন্ত্র ও গলদ 'আকীদাহ্ ইসলামের লেবাসেই সম্পন্ন করেছে। হাদীসের নামে মিথ্যা কথা, বানোয়াট বিষয়সমূহ সুচতুরভাবে ইসলামের আঙিনায় রোপন করেছে। ফলে মুসলিম জাতি ধীরে ধীরে তাদের মূলকেন্দ্র হতে দূরে সরে গেছে।

মুসলিম বিশ্বে ইয়াহূদী চক্রান্তের নীল-নকশা

জাতি দলীয় দ্বন্দ্ব-কলহের শিকার হয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে ধাবিত হয়। পরিণাম ফল মুসলিমদের জাতীয় গৌরব বিনষ্ট ও অবশেষে পরাশক্তির মুখাপেক্ষী হওয়া যা দুনিয়ার সম্মান ও মর্যাদা বিলুপ্তি হওয়ার সাথে সাথে আখিরাতের পথও অন্ধকার হয়ে যায়।

দশ বৎসর পূর্বে দৈনিক 'ইত্তেহাদ' পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক জনাব 'আবদুল খালেক সাহেব কর্তৃক ইয়াহূদী চক্রান্ত বিশ্বব্যাপী ষড়যন্ত্রের ঐতিহাসিক দলীল স্বরূপ একখানা অতি মূল্যবান তথ্যপূর্ণ বই (মারুফ পাবলিকেশন্স, ঢাকা হতে মুদ্রিত) রচনা করেন। উক্ত বইখানিতে ইয়াহূদী চক্রান্তের বহু গোপন তথ্য উদ্‌ঘাটন করেছেন। ঐ সময় করাচীর 'জং' পত্রিকা এবং সাপ্তাহিক উর্দু 'এশিয়া' নামক পত্রিকায় 'ফ্রী ম্যাশন' আন্দোলন সম্পর্কে যথেষ্ট গুপ্ত রহস্য প্রকাশ হয়েছে।

বিশ্বব্যাপী ইয়াহূদী চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র তথ্য সম্বলিত 'প্রটোকল' নামক পুস্তকের বরাতে বলেছে; মুসলিম দেশগুলোতে বর্তমানে যে অবস্থা বিরাজমান তা ইয়াহূদীদের পরিকল্পিত নীলনকশা ও চক্রান্ত। উক্ত গ্রন্থ হতে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করছি :

১। ধর্মের প্রতি যুব সম্প্রদায়কে বীতশ্রদ্ধ করে তোলা এবং ধর্মনেতাদেরকে বিদ্রুপের পাত্রে পরিণত করা।

২। মদ, জুয়া, সিনেমা ইত্যাদির মাধ্যমে যুব সম্প্রদায়কে উন্মাদ করে তোলা; আর নাইট ক্লাব ও সোসাইটি লেডিদের মাধ্যমে নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতার উৎসাহ প্রদান করা।*

---

* পুলিশের পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশে দু'শোর বেশী পতিতালয়, দু'শোরও বেশী যৌনসংঘ আছে। যারা সারা দেশে বারবনিতা যোগান দেয়। প্রায় দশ লক্ষ মানুষ প্রতি মাসে বাজারের সামনে বা রাস্তার ধারে কর্মরত অথবা উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গদানকারিণী হিসাবে কর্মরত বেশ্যাদের কাছে গমন করে। (জেরুজালেম পোস্ট, আগস্ট ২৮/২০০০)

৩। পুঁজিবাদী অর্থনীতির মাধ্যমে অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি। শ্রমিক আন্দোলনের নামে সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা নষ্ট করা।

৪। একনায়কত্ববাদী শাসনের মাধ্যমে জনগণ ও সরকারের মধ্যে পরস্পর পরস্পরের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করা।

তাই এদের সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন :

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ وَلُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا بَلْ يَدٰهُ مَبْسُوْطَتٰنِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ..... وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ﴾

"ইয়াহূদীগণ বলে, 'আল্লাহর হাত রুদ্ধ (কৃপণতা) তারা-ই রুদ্ধহস্ত এবং তারা যা বলে তজ্জন্য তারা অভিশপ্ত, বরং আল্লাহর উভয় হস্তই প্রসারিত; যেভাবে ইচ্ছা তিনি দান করেন .... তারা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করে বেড়ায়; আল্লাহ ধ্বংসাত্মক কার্যে লিপ্তদেরকে ভালবাসেন না।" (সূরা মায়িদাহ্ ৫ : ৬৪)

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন অপর আয়াতে তাদের সম্পর্কে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেন :

﴿لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ﴾

"অবশ্য মু'মিনদের প্রতি শত্রুতায় মানুষের মধ্যে ইয়াহূদী ও মুশরিকদেরকেই তুমি সর্বাধিক উগ্র দেখবে।" (সূরা মায়িদাহ্ ৫ : ৮২)

আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের শেষ পরিণতি একদিন এভাবেই ঘটবে বলেছেন। তাই এখানে সহীহ বুখারী ও মুসলিমের হাদীস দু'টি প্রণিধানযোগ্য :

তোমরা নিশ্চিতভাবে ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং নিশ্চিতভাবে তাদের হত্যা করবে। (আর এটা চলতে থাকবে) যতক্ষণ না (এমনকি) পাথরসমূহ কথা বলবে (এই বলে) : হে মুসলিম! আমার পিছনে একজন ইয়াহূদী লুকিয়ে আছে, আস এবং তাকে হত্যা কর।

(সহীহুল বুখারী)

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযি.) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন : মুসলিমরা ইয়াহূদীদের সাথে যুদ্ধ না করা পর্যন্ত শেষ প্রহর আসবে না। মুসলিমগণ ইয়াহূদীদের হত্যা করতে থাকবে এবং এমন অবস্থা আসবে যে, ইয়াহূদীরা একটি পাথর অথবা একটি গাছের পিছনে লুকাবে এবং পাথর বা গাছ বলবে : হে মুসলিম! (অথবা, হে আল্লাহর বান্দা) আমার আড়ালে একজন ইয়াহূদী আছে, এসো তাকে হত্যা কর; কেবল গারকাদ নামক বৃক্ষটি তা বলবে না, কেননা ওটা হচ্ছে ইয়াহূদীদের বৃক্ষ। (সহীহ মুসলিম)

ইয়াহূদী চক্রান্তের শিকার তুরস্ক

ইয়াহূদীদের এ চক্রান্ত اليهود العالمى 'আল ইয়াহূদুল আলামী' নামক পুস্তক হতে উর্দূ ডাইজেস্টে তর্জমা করে লেখক তথ্য সংগ্রহ করতঃ একত্রিত করেছেন। এদের আন্দোলনকে আরবীতে 'সাইহুনিয়াত' বলা হয়। যাকে ইংরেজীতে 'জিউইশ এজেন্সী' বলা হয়। উক্ত গ্রন্থে তুরস্কে কিভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে আন্দোলন সৃজন করা হয় তার বর্ণনা ও ভয়াবহতা সম্পর্কে উল্লেখ হয়েছে।

ইয়াহূদীরা সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নানাবিধ চক্রান্তের জাল বিস্তার করে। একদিকে আরব ও অনারবদের মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টির মাধ্যমে তুর্কী খিলাফতের অধীনে যেসব আরব অফিসার ও সৈন্য নিয়োজিত ছিল; ইংরেজ ও ইয়াহূদ সম্প্রদায় সম্মিলিতভাবে তাদের মনে তুর্কী সুলতানের প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টির কাজ শুরু

করে। আঞ্চলিকতাবাদ ও ভাষাগত জাতীয়তার সত্তা ও মুখরোচক শ্লোগানে মুসলিমদের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করে। তাদের দুর্বল করার হীন প্রচেষ্টা নব্য সমাজকে সহজে আকৃষ্ট করে এবং এর ফলে আরব-তুর্ক সম্পর্ক বিনষ্ট হয়। অপরদিকে 'ফ্রী ম্যাশন' আন্দোলন তুর্কীর অভ্যন্তরে যুবক শ্রেণীর মাধ্যমে খিলাফত ও ইসলামের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলার কাজে সূক্ষ্মভাবে লিপ্ত হয়। তুর্কীর বিপ্লব প্রধানতঃ ইয়াহূদীদের পরিকল্পনা মোতাবিক সংগঠিত হয়েছিল। তুর্কী আন্দোলনে নিহত ব্যক্তিদের একটি মাত্র অপরাধ ছিল! আর তা হলো ইসলামী আদর্শের প্রতি অটল বিশ্বাস। কামাল পাশা ইসলামী ইবাদাত, ইসলামী রীতিনীতি ও আদব-কায়দা সবকিছুই নিষিদ্ধ করে। এমনকি আরবী ভাষায় কুরআন পাঠ করাও অপরাধ বিবেচনা করে।

এভাবে ইসলামবিরোধী ও ইয়াহূদী প্রভাবান্বিত পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ফলে মধ্যপ্রাচ্যে ইয়াহূদী রাষ্ট্র স্থাপনের পথ প্রশস্ত হয়ে যায়। 'ফ্রী ম্যাশন' আন্দোলনের প্রভাবে কামাল পাশার ইসলাম-বিরোধী তৎপরতা ইয়াহূদীদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ আরও সহজ হয়ে যায়। ইয়াহূদী চক্রান্ত একদিকে মুসলিমদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ সৃষ্টি ও নানাবিধ ছদ্ম আন্দোলনের মাধ্যমে যুব-সমাজকে ইসলামের প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন করে।

তাই দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে কবির ভাষায় উল্লেখ করছি : **"হে মরুবাহী আরব! আমার ভয় হচ্ছে তুমি কাবা গৃহে পৌঁছাবে না। (কারণ) তুমি যে রাস্তা দিয়ে চলেছ তা তুরস্কের রাস্তা।"**

অর্থাৎ আমাদের লক্ষ্য আল্লাহর ঘর পবিত্র কাবা কিন্তু আমাদের 'আমল-'আকীদাহ্-আদর্শ তুরস্কের পথে অর্থাৎ বিপথে অগ্রসর হচ্ছে।

মুসলিম সমাজে সমাজতন্ত্রের রূপরেখা

বর্তমান বিশ্বে এ ইয়াহূদী ষড়যন্ত্রের শিকার মুসলিম সমাজের এক শ্রেণীর যুব-সম্প্রদায়। এরা ইয়াহূদীদের এজেন্ট তথা সমাজবাদ নামীয়

শ্রেণীর দ্বারা পরিচালিত। এরা ভারত ও বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় অপরের প্রতারণার যে শব্দ ও বুলি বেছে নিয়েছে তা হল সর্বহারার বুলি।

পূর্বে পারস্য দেশে মুযদাক নামীয় ব্যক্তির আবির্ভাব হয়। তার মত হল, মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহ সৃষ্টি হয় দু'টি বস্তু নিয়ে– একটি হল সম্পদ; অপরটি হল নারী।

অতএব সম্পদ সমবণ্টন করা ও নারীকে সমভোগ্য করা হলে সমাজের অশান্তি দূরীভূত হবে। মারামারি দ্বন্দ্ব-কলহ উঠে যাবে। আর এই মতের সাগরেদ সমাজতন্ত্রীরা, এরা সময়ে জোরে-শোরে নিজেদের প্রয়োজন ক্ষেত্রে অর্থনীতির বৈষম্য দূরীভূত করণার্থে সমবণ্টনের কথা বলে। এরা সমাজ ব্যবস্থার প্রতিবাদমূলক কথা বলে। দাম্পত্য জীবনের গুরুত্ব হ্রাস করতঃ সেখানে ভেদাভেদ রহিত করে সকল নর-নারীর সাথে মিলন ও বিবাহ বৈধ বলে দাবী করে।

অতএব এদের সাথে উচ্ছৃঙ্খল কামুক যুবক শ্রেণী যোগ দেয়া এক অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। সম্পদ সমবণ্টনযোগ্য, অর্থাৎ মালিকানা স্বত্ব বাতিল। আর তখন মজুর শ্রেণীর জন্য তা বড়ই আনন্দদায়ক কথা। স্কুল-কলেজে এ মতের প্রচার ও প্রসার হওয়ার কারণ তা অতি সহজে অনুমেয়। এরাই সুচতুরভাবে প্রথমে প্রগতির নামে জাতীয় ঐক্য ও চেতনার নাম দিয়ে কখনও ধর্মের গোঁড়ামী উৎখাত করতঃ সাম্যমৈত্রী স্থাপন আর মানুষে মানুষে ভেদাভেদ রহিত ইত্যাদি কথাগুলো প্রথমত প্রচার করে তারপর ধনী, দরিদ্র, শ্রমিক মজুর ও মালিকদের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণের বাহানার মাধ্যমে সুষ্ঠু সমাজ গঠনের কথাগুলো বিভিন্নভাবে প্রচার করে থাকে।

সমাজতন্ত্রের ভাওতায় চরিত্রের অধঃপতন

সমাজতন্ত্রের লেবেলধারী এদের এ অনুসারীরা নিজেদের ব্যাপারে ভাল-মন্দ, ভুৎ-ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কতটুকু বোধশক্তি রাখে তা বিচার্য। কারণ খাৎনাকৃত জাতি হিসাবে তার জাতীয় সত্ত্বা সর্বহারার বুলীর সাথে কতটুকু

সামঞ্জস্যপূর্ণ তা সে আদৌ ভেবে দেখে না! খাৎনা করার কারণে যে সমাজভুক্ত তার আদি পূর্বপুরুষগণ ছিলেন; তাঁদের জীবন যাপনের মানের স্থান তার আগত জীবন ব্যবস্থার ব্যবধান ও পার্থক্যের বৈশিষ্ট্যতার প্রতি এবং নবাগত আদর্শের মূল বিষয়বস্তুর গভীরে চিন্তা ও পরিণাম ফল সম্পর্কে সে আদৌ ভেবে দেখে না। যে ধর্মনীতি বিশ্বশান্তি ও মানবতার মর্যাদা, সবল দুর্বলের মধ্যে সাম্যতা পাপ-পূর্ণ বৈধ-অবৈধতার কারণে কৃচ্ছসাধনা সংযত জীবনে পশুমনোভাবের প্রতি সততার চাপ, লজ্জা ও শালীনতার ভদ্রাবরণী সবকিছু তার নিকট হতে দূরে সরিয়ে মহান স্রষ্টা সবকিছুর একচ্ছত্র মালিক আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন হতে তাকে ক্রমান্বয়ে ইবলিসী শক্তির কবলে নিক্ষেপ করা হচ্ছে সে আদৌ তা ভেবে দেখে না।

তাদেরকে সর্বপ্রথম পাখীর বুলির ন্যায় শিখানো হয় যে, ধর্ম মানুষকে পাপের ভয় দেখায় : ধর্ম নেতারা তাদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খেতে চায় নিজেদের কর্তৃত্ব বজায়ার্থে ধর্ম নামীয় একটা পৃথক সত্ত্বা স্বার্থান্বেষী মানুষগণ নিজেরা ঐ ধোঁয়া বানিয়ে নিয়েছে। 'ধর্ম মানুষকে তৈরী করেনি। মানুষরাই ধর্ম বানিয়ে নিজেদের প্রভুত্ব করার পথ করে নিয়েছে।' তাই ভাঙো ধর্মের বাঁধ। যেহেতু ধর্মের দোহাই দিয়ে ভীতি প্রদর্শন করতঃ মানুষকে বিশেষ করে পৃথিবীর অর্ধাংশ মানুষ নারী জাতিকে প্রগতির পথ হতে বাধা দিয়ে পশুর ন্যায় খাঁচায় পুরে রেখেছে। অতএব মেয়েদের কাজে নামাতে হবে।

অর্থাৎ সমানাধিকার দাবীতে রাস্তায় রাস্তায় ফিরাতে হবে। তাদের রূপ যৌবনের প্রদর্শনী স্বরূপ নাইট ক্লাবে লেডি সোসাইটির নামে যুবকদের উপস্থিতিতে মিটিং মজলিসে বক্তৃতার মঞ্চে আনতে হবে। প্রতিটি কর্মে অর্থাৎ আন্দোলন নামক সভা আমদানী করতঃ শিখানো পাখীর মিষ্টি বুলীর আওয়াজে উদার নীতি প্রদর্শনমূলক যুবকদের হাত ধরাধরি করতঃ নাচ ও গানের আসরে যুবকদের মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় শরীক হয়ে দেশে দেশে প্রগতি আনবে। কোন কোন যুবকদের অবশিষ্ট চরিত্রবলটুকুও পঙ্গু করতঃ জাতির নৈতিক পতন ঘটাতে হবে। তা হলেই ধর্মের বাঁধ বিধি-নিষেধের বেড়া

ভাঙা হবে। এটাই হল প্রগতি! অথবা বেশীর বেশী হলে দু'চারটি মেয়েকে অফিসে চাকুরী দিয়ে অফিসারদের মস্তক ধোলায়ের কাজ হবে।

উৎপাদন ক্ষেত্রে বাংলার মাটিতে চৈত্র বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠের গরমে প্রখর রৌদ্রে মাঠে চাষাবাদ করবে কৃষক ভাই আর বাবুরা ক্লাবে থেকে গরম গরম বক্তৃতা দ্বারা প্রগতি ডেকে আনবে। আর নিজেরা দালানে থেকে ভাল ভাল জামা কাপড়ের পোষাকে প্রভূত পৈতৃক সম্পত্তির মালিক হয়ে বড় বড় ব্যবসা ও দোকানের অধিকারী হয়ে তারা ধনী দরিদ্রের বাঁধ ভাঙ্গবে ও সর্বহারার রাজ্য আনবে। নিজেরা থাকবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে অসহায় গরীব কৃষকদের দুঃখ মোচন করবে। আর এ কৃষকদের সন্তানগণ যারা কিছু লেখাপড়া ও নিষ্প্রয়োজনীয় কাপড়চোপড়ের পিছনে অর্থ খরচ করে নতুন পোষাক পরে নেতৃত্বের মোহে বিভোর হয়ে ঐ সব বাবুদের পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াবে।

সমাজতন্ত্রের মিথ্যা প্রতিফলের পরিণাম

আর ঐ সমস্ত নেতাদের পক্ষ হতে বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশে রচিত ও প্রচারিত কথায় সাধারণত মানুষ ভুলে যায় তাদের অজ্ঞতার জন্য। তারপর ধর্মের নামে পেট পালা জাতির কবল হতে এবং শোষিত মজলুমদের দুঃখ হতে সমাজকে উদ্ধার করা ইত্যাদি ভাষায় জনগণের নিকট সমর্থন আদায় করতঃ হৈ চৈ ও গোলমালের সৃষ্টি করে। গণআজাদীর নামে নিজেদের পক্ষ হতে একটা বিশেষ শক্তিকে ঠেলে ক্ষমতার গদীতে বসিয়ে দেয়। কিন্তু অল্প দিন পরই দেখা যায় যে, জনগণ যে সামান্য সুযোগ-সুবিধাটুকু ভোগ করছিল তাও তারা এদের চক্রান্তে হারিয়ে ফেলে। যেহেতু তারা অন্ধের মত ঐ চাটুকারদের কথায় হুমড়ী খেয়ে অন্ধকারেই পড়ে যায়। পরিশেষে যে সমানাধিকার অর্জনের জন্য হৈ চৈ সংগ্রামের নামে বিশৃঙ্খলার দিকে এগিয়েছিল তাতে ভ্রাতৃত্ব, ঐক্যতা, সংহতি সবকিছু বিনষ্ট হয়ে স্থিতিশীলতা হারিয়ে আরও বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতার দরজা খুলে যায়। এসব

কারণে পরস্পরের উপর প্রাধান্য বিস্তারের তীব্র দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। ফলে এরা সমাজের উত্তম শ্রেণীর লোকদের আঘাত করতে এগিয়ে আসে। আর পরিণাম হয় এক উদাসীন ও নীতি বিবর্জিত ও হৃদয়হীন সমাজের জন্ম। কারণ এই কৃষক ও মজুরগণ অজ্ঞতাবশতঃ উপরতলার নেতাদের সুচতুরভাবে প্রণীত বাক-চাতুরীর খপ্পরে পড়ে পারস্পরিক বিভেদের বীজ এমনভাবে বপন করে যা সহজে তুলে ফেলা ও ভুলে যাওয়া কোন ক্রমেই আর সম্ভব হয় না। ক্রমান্বয়ে বিবদমান অবস্থা ঘোলাটে হয়ে আরও কদর্য হয়।

আর যেমন নেশাগ্রস্ত জানোয়ারকে যথেচ্ছা ব্যবহার করা যায়। তাই ঐরূপ যুবকদের স্কন্ধে ভর করে ধুরন্দর মহলটি স্বেচ্ছাচারিতা ও বিলাসিতার অন্বেষণে কপট শ্রমিকনেতা সেজে শ্রেণী বিদ্বেষের সবক দেয়। আর ঐ বোধশক্তিহীন যুব সম্প্রদায় যাদের বাপ-চাচারা এখনও ক্ষেত-খামারে প্রখর রৌদ্রে প্রয়োজনের কম কাপড় পরিধান করতঃ মাঠে-ঘাটে গরু-হালের পিছনে ধান মাড়াই খামারে মাথার ঘাম পায়ে ফেলছে। আর এরা বোধশক্তিহীনতায় নৈতিক অধঃপতনের ক্ষেত্রে কোথায় পৌঁছেছে তা আদৌ অনুভব করতে পারে না। রাজনীতির ধোয়ায় অপরের সম্পদ কি উপায়ে বিনষ্ট করা যায় সমানাধিকারের বুলীতে সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে বংশানুক্রমিক পরোপকারী সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর লোকদের প্রতি উপক্ষেণীয় আচরণ দ্বারা দেশ ও সমাজকে কতখানি বিষাক্ত করতে এরা অগ্রসর; এটা তাদের চিন্তা বহির্ভূত ব্যাপার হয়েছে।

সত্য ধর্মের 'আকীদা ও বিশ্বাস সবকিছু ভাবাবেগে হারিয়ে গ্রামে গঞ্জে শহরে দলীয় কোন্দলের কোলে কিভাবে ঠেলে দিচ্ছে, তা অনুধাবন করা এদের চিন্তাশক্তির ঊর্ধ্বে। এর ফলে এমন এক হৃদয়হীন মানবতা বিবর্জিত গোষ্ঠীর উদ্ভব হচ্ছে; সেখানে নীতি-নৈতিকতা কল্যাণকর জীবন ব্যবস্থা, স্থিতিশীল সমাজ ব্যবস্থা সবকিছুর বিপরীত যে অন্ধ পশুশক্তির আবির্ভাব হচ্ছে, তা এ যুব সম্প্রদায়ের খতিয়ান করে দেখার অবসর নেই। এরা

সর্বদাই অপর চতুর মহলের পরামর্শ ও অনুগ্রহে পরিচালিত হয়। এ যেন কতকগুলো মস্তিষ্কবিহীন চিন্তাবিদ নামের জনসমষ্টি। এদের উপর মহলে সত্যিই সত্যি প্রতিভাবান লোকের অস্তিত্ব থাকলেও তথাপি দলীয় রাজনৈতিক বিচার-বিবেচনার ক্ষেত্রে চিন্তায় যা প্রকৃত ন্যায় সত্য ও বাস্তবভিত্তিক না হওয়ায় এবং ধারকৃত অপর মস্তিষ্কের অন্ধ অনুকরণের কারণে কোন কল্যাণকর ব্যবস্থা এদের নেতৃত্বে নেই।

এদের উদ্দেশ্য জনসাধারণের ন্যায্য অধিকার আদায় বা দেশ ও জাতির উপর হতে যাবতীয় নিপীড়ন বন্ধ করা নয়। সর্বস্তরের মানুষকে সুখ-সুবিধা দেয়া নয়। **বরং অত্যাচার, অনাচার, অবিচার আর প্রহসনের মাধ্যমে কুটিলতায় কিভাবে ক্ষমতার বলয়কে অক্টোপাশের মত আঁকড়ে থাকা যায় আর তারই এক উদ্‌গ্র উন্মাদনার হয় বহিঃপ্রকাশ।**

ইসলাম যে মানবতা ও ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রকৃত মর্যাদা দান করেছে তার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে নেই। যে ইসলামের শাসনব্যবস্থা পৃথিবীর সকল শ্রেণীর মানুষ সাদরে গ্রহণ করেছিল, যার শাসনকালের ন্যায় পৃথিবীর বুকে আর ঐরূপ শান্তি শৃঙ্খলা আর স্থাপিত হয়নি। যাঁর সৈন্যগণ কোনও যুদ্ধে পরাজয় বরণ করেনি, পৃথিবীর বুকে অর্থ ও সামরিক শক্তিতে সে সময় নজীরবিহীন শক্তির অধিকারী পারস্য ও রোম সাম্রাজ্য। আর এই দুই রাজ্যের সৈন্য সংখ্যার এক চতুর্থাংশেরও কম সংখ্যক সৈন্যগণ ঐসব সাম্রাজ্য জয় করলেন এবং পৃথিবীর যেখানেই তাদের পদার্পণ হল, সেখানেই স্বস্তির ও শান্তির বাতাস বইতে থাকল, শাসক শাসিত ইতর-ভদ্র ধনী-দরিদ্র সকল শ্রেণীর মধ্যে সমতা ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপিত হল। সকলেই এক কাতারে একত্রিত হয়ে মহান ও মহীয়ান স্রষ্টার দরবারে দাঁড়াতেন, আর নতজানু হয়ে তাঁর করুণা ভিক্ষা করতেন সেই একক স্রষ্টার সৃষ্ট মানুষ হিসাবে সবাই এক ও অভিন্ন। মনের অতৃপ্তি ও অনটন সবই দূরীভূত হয়ে গেল, নেমে আসল পৃথিবীর বুকে অবিরল ধারায় রহমাতের প্রবাহমান স্রোত ।

ইসলামী সাম্যতা বনাম সমাজতন্ত্রীদের ভাওতা

ইসলামের শত্রুর দ্বিতীয় গ্রুপ হলো সমাজতন্ত্রের অসার বুলী-বাজরা। দেশ ও সমাজের উঁচু-নিচুর ব্যবধান দূর করা, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমবন্টন ও সমাজের উঁচু-নিচু ভেদাভেদ দূর করার জন্য বড় মায়া-কান্না এদের বক্তৃতায়। অর্থনৈতিক মুক্তির অন্তরালে মজুরদের দানাপানি খোরাক, পোষাক যোগানোর নামে তাদেরকে আকৃষ্ট করে– যার পরিণাম ঐ শ্রেণীকে পশু শ্রেণীতে পরিণত করা ও নিজেরা তাদের উপর মাতব্বরী করা। তারা থাকবে সুন্দর সুন্দর প্রাসাদে, ইজি চেয়ারে বসে ইলেকট্রিক পাখার তলে আরাম-আয়েশ করবে। আর বক্তৃতার ময়দানে কৃষক মজুরদের মনোরঞ্জনমূলক ভূয়া বক্তৃতা দিয়ে দলে ভিড়াবে। আর ঐ সাথে সামাজিক বৈষম্য দূর করার অসার বুলী আওড়াবে।

ভারতের হিন্দু নেতাগণ যারা সমাজবাদের মন মাতানো বুলী আওড়ায় তারা নিজেদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা লগ্নী করা থেকে শুরু করে সব কিছুতেই তারা বুর্জোয়া সম্প্রদায় বাড়ী-গাড়ীর মালিক তারা, আবার সর্বহারার শ্লোগান দিয়ে অপরদের বুর্জোয়া বলে ফতোয়া দেয়। আদপে গরজ বড় বালাই, আবার কেউ চাটুর্জে মুখুর্জ্জে, বাড়ুজ্জে উপাধীর ভূষণে আত্মহারা। হিন্দু সমাজের তফসিল ও অচ্ছুতদের এবং মুসলিম অশিক্ষিত যুবকদের উস্কানী দেয়, অথচ তাদের অন্তর ঐসব মুসলিমদের নেড়ে আখ্যার উর্ধ্বে স্থান দেয় না। সাম্যের বুলী এদের মুখের দাবী, মুনাফিকী ভাওতা ইসলামে সাম্যের ইতিহাস তাদের কানে পৌঁছাতে দেয় না।

ইসলামে তো চাটুর্যে, বাড়ুর্যে, মুখোর্জে, ভট্টাচার্য বলে জাতিভেদ্য প্রথা নেই তারাতো ভাই ভাই এক জাতি। এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সকলেই এক স্রষ্টার বান্দা, একই উপাসনাগৃহে একে অপরের সাথে কাঁধে কাঁধ, পায়ে পা মিলিয়ে একই স্রষ্টার সামনে নতজানু হয়। সকলের উপাসনানীতিও এক, প্রার্থনার ভাব ও ভাষা এক, একই সাথে পানাহার করে। সুতরাং তাদের সাম্যতা পৃথিবীর অন্য কোন

জাতির মধ্যে বিদ্যমান নেই। বাদশা-আমীর প্রজা-ফকীর সব এক কাতারে দণ্ডায়মান, একই সাথে মাথা নোয়ায়, একই সাথে মস্তক উত্তোলন করে।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে অভিজাত শ্রেণী কুরাইশ বংশের মহিলার সাথে একজন মুক্ত কৃতদাসের বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে। উপাসনাগৃহে একজন দাস বড় বড় কুরাইশদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এ সমাজে দেখা গেছে সালেম নামক ব্যক্তি-যিনি এক কুরাইশ ব্যক্তি আবূ হুযায়ফার ক্রীতদাস ছিলেন, তিনি মাদীনায় পৌছে মাক্কায় বড় বড় অভিজাত কুরাইশ তন্মধ্যে স্বয়ং 'উমার (রাযি.)ও ছিলেন, তাদের সালাতে ইমামতি করছেন। মাদীনার অন্যান্য অমুসলিমরা এ দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছে, কে এ ইমাম সাহেব? যিনি কুরাইশদের সর্বশ্রেষ্ঠ বংশের সন্তানদের ইমামতি করছেন উপাসনা ক্ষেত্রে? যারা চিনল তারা প্রকাশ করল যে, এ সেই অমুক ইয়াহূদী রমণীর ক্রীতদাস সালেম-যাকে মাক্কার অমুক কুরাইশ খরিদ করে নিয়ে যায়, তখন তারা বলে উঠলো একজন ক্রীতদাস আজ অভিজাত বংশ কুরাইশদের উপাসনার নেতৃত্ব দিচ্ছে! এ ব্যাপারটি দর্শনের শেষে তারাই স্বীকার করে নিলেন যে এরা ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তাই এদের মধ্যে ছোট বড় উঁচু-নিচুর ব্যবধান নেই, দেখ না কত সুন্দর কুরআন পাঠ করছে। ইসলামের দ্বিতীয় রবি শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ খলীফা 'উমার (রাযি.) তার জীবন সায়াহ্নে আক্ষেপ করে বলেছিলেন :

আজ যদি সালেম বেঁচে থাকতেন তবে তাকেই আমি মুসলিম জাতির খলীফা করে যেতাম। ইনি আমাদের সেই মহান নেতা যাকে দর্শনের পর জেরুযালেমের চাবি ছেড়ে দেয়া হবে বলে খৃষ্টান পাদরী ও নেতাগণ আহ্বান করেন। তিনি যখন জেরুযালেমের প্রবেশ দ্বারে পৌছান তখন তাঁর উটে তার গোলাম আসলামকে বসিয়ে নিজে লাগাম টেনে যাচ্ছেন।

মাদীনা হতে সুদীর্ঘ পথ পালাক্রমে একজন উটের উপর থাকবে, অপর জন লাগাম ধরে টানবে। ঐ সময় গোলাম আসলামের উটের উপর বসার পালা ছিল, আর খলীফার লাগাম ধরে উট চালানোর

সময়। আর এ জাতিকে আবার সাম্যের বুলী আওড়ায় ভারতের চাটুর্য্যে, বাড়ুর্যেরা। তাদের নেতাদের ইতিহাস তাদের জানতে দেয়া হয় না। কেননা যখনই এ কথা প্রকাশ হয়ে প্রমাণিত হবে যে, ইসলাম ছাড়া অন্য কিছুতেই মানুষ সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধিত হয় না, এ কথা মুসলিম যুবকগণ জানতে পারলে ঐসব কপট সাম্যবাদীদের চক্রান্ত ধরা পড়ে যাবে তাই তাদের মূল শিক্ষা-দীক্ষা হতে দূরে সরিয়ে রাখা হয়। অনুরূপ নিকট ও দূর, আপন ও পর সকল নর-নারীর জন্য সমভোগ্য এতে কোন বৈধ-অবৈধ হালাল-হারাম সামাজিক রীতি-নীতির বালাই নেই। কিন্তু প্রথমতঃ আসল রূপ এদের বুঝতে দেয় না বরং বিভ্রান্তিমূলক কথাবার্তা এবং মানুষকে বিভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করা ইসলামের শত্রুদের চির স্বভাব। যা মানব সমাজের চিরশত্রু ইবলিসের কাজ এদেরও ঐ নীতি, এতেই এদের আনন্দ।

মুসলিম সন্তানদের ধর্ম ও চরিত্র নষ্ট করে তাদের সবকিছু হারিয়ে সর্বহারা করতঃ নিজেদের ক্রীড়ানকে পরিণত করাই এদের মূখ্য উদ্দেশ্য– কেননা এরা মূলতঃ স্রষ্টাকেই অস্বীকার করে থাকে, এটাই হল সমাজতন্ত্র বা মার্কস্‌বাদীর মূল তত্ত্বের কাঠামো। তাই আজ ইউরোপ হতে সমাজতন্ত্র দর্শন ও মতবাদ নির্বাসিত হতে চলেছে। ইতালী, ফ্রান্স এবং স্পেনের কমিউনিস্ট চিন্তাধারার মানুষগুলো মার্কস্‌বাদের চর্চায় সেরূপ আর মুখরিত নয়। তারা চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা ভোগ করার পরিপ্রেক্ষিতে ইউরো কমিউনিজম নামে এক নয়া তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছে অর্থাৎ স্রষ্টার স্বীকারকে স্থান দিতে হবে। ইতালী, বৃটেন, ফিনল্যান্ড, আলবানিয়ার কমিউনিস্টগণ রাশিয়ার সর্ব বিষয়ের তল্পিবাহক হতে রাযী নয়, তাদের মতে রাশিয়া পুলিশী রাজ্য ছাড়া আর কিছুই নয়। স্বাধীন চিন্তা ও মানবতার বিকাশ সেখানে অবান্তর, তাই তারা মার্কস্‌বাদীকে সভ্য মানুষের প্রতি এক নির্মম পরিহাস বলে আখ্যায়িত করেছে।

ইসলামে যে মানবতা ও ব্যক্তি স্বাধীনতার মর্যাদা দিয়েছে যার নযীর পৃথিবীতে দেখা যায়নি কিন্তু তারা ইসলামের ইতিহাস ও ইসলামী চর্চা

হতে জনগণকে দূরে রাখতে চায় যাতে তাদের সমাজবাদের ধূয়ায় জগদ্বাসীকে ফিরিয়ে রাখতে সমর্থ হয়। আর কতিপয় অপরিণামদর্শী মাথাওয়ালাদের খোরাক ও দানা যোগানোর নামে পশু শ্রেণীতে পরিণত করা তাদের চিন্তাধারার শেষ দৌড়। স্রষ্টা ধর্মনীতি-নৈতিকতা ও বৈধ-অবৈধের কোন বালাই এদের নেই। মার্কস্ তত্ত্বের মূল কাঠামোই অবাধ ও লাগামহীন নীতি। তাই কতিপয় এলাকা বিশেষ ছাড়া ঐ নীতি গ্রহণে আজ আর কেউ রাজী নয়।

ইসলাম যে ব্যক্তি স্বাধীনতার মর্যাদা দান করেছে তার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে নেই। কেননা ইসলাম বিশ্ব স্রষ্টার মনোনীত দীন, তিনি একমাত্র বিশ্বজগতের স্রষ্টা তাঁর সকল বান্দার কল্যাণ যেভাবে সাধিত হয় সেই ধরনের কানুন নির্ধারণ করেছেন।

মোটকথা ইসলাম এমন এক বিস্ময়কর শক্তি-যা পশুশক্তির মুখে লাগাম দিয়ে নিরীহ শিশু স্বভাবে পরিণত করে। শাসন বিভাগে বিচারাচারের ক্ষেত্রে তার ব্যবহার হলে ভণ্ডামীর আফিমে বুঁদ হয়ে থাকা সমাজবাদী বুলীওয়ালারা যে প্রলাপ করছে তা তাদেরকে আলো দান করবে। নেশা ছুটিয়ে সুস্থ মানব গোষ্ঠীতে পরিণত করবে। কিন্তু ইসলামের ঐ সুমহান নীতি ও নির্মল আদর্শ বুঝা বা অনুধাবন করার বিধান তাদের চিন্তা-শক্তির ঊর্ধ্বে। তারা ধর্মের মহত্ব ভুলে হিংস্র পাশবিকতাকেই মানব সমাজের কল্যাণ ভেবে বসেছে। তারা মানবীয় সমস্যার সমাধান ভিন্ন পথে দেখে। যেখানে কেবল আছে পেট ও তার নিচের অংশের হিসাব নিকাশ। এদের উপর তলার লোকেরা ইসলামের সুমহান ছবি বুঝে ও উহার বিকাশের পথে বাধা দেয়, কেননা ইসলাম তাদের কাছে পাশবতন্ত্রের বাধাস্বরূপ।

যে ইসলাম দানব শক্তি জ্বীনগণকে করেছিল সংযমশীল, তারা মানুষ রমণীর উপর পাশব শক্তি প্রয়োগ করত, ইসলাম গ্রহণের পর তারা সৎ শুদ্ধ হয়ে মন্তব্য করছেন "ইন্নান্‌নাবিইয়া কাদ হাররামাযযিনা" ইসলামের

নাবী ব্যভিচারকে হারাম করেছেন। যাদের উপর রাজশক্তি, পুলিশী দাপট কার্যকরী হয় না তারা ইসলামের বদৌলতে নিরীহ শ্রেণীতে পরিণত হচ্ছেন। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও সমাজবাদীরা আধা জাহিল মুকাল্লিদরা (অন্ধ অনুসারী) সব কিছু ধামা-চাপা দিয়ে তাদের পাপ-পুণ্যের চিন্তাশূন্য করে তাদের কলুর বলদ বানাতে চায়। পারলৌকিক জীবন বিলুপ্ত করে দুনিয়াকে "শাদ্দাদের বেহেশত" বানাতে তৎপর হয়। প্রজাগণকে ধর্ম হতে বিচ্যুত করে। এ শ্রেণী তাদের উপর অবৈধ কর্তৃত্ব বজায় রাখতে তৎপর।

ইসলাম মানবতার ধর্ম, ইসলাম শান্তির ধর্ম, ইসলাম ভ্রাতৃত্বের ধর্ম, ইসলাম পরিপূর্ণভাবে পবিত্রতার ধর্ম।

দীন ইসলাম বিশ্বস্রষ্টা মহান রাব্বুল 'আলামীন ওয়াহদাহু লা শরীক আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার মনোনীত দীন, যার মধ্যে ইনসাফের চিত্র এরূপভাবে চিত্রিত ও বিকাশমান হয়েছে যাতে আপন ও পর, নিকট দূর, সবল ও দুর্বল, স্বপক্ষ ও প্রতিপক্ষ সকলের প্রতি ইনসাফের পূর্ণাঙ্গ আদর্শ ফুটে উঠেছে।

ইসলামের এ ইনসাফ এমনভাবে প্রকাশমান ও বিকশিত হয়েছে যার কারণে মাক্কা ও মাদীনা তথা আরব ভূমি হতে প্রবাহিত হয়ে সমস্ত পৃথিবীকে তা সিক্ত করেছে। পৃথিবীর বুকে ইনসাফ বৃক্ষটি সুজলা-সুফলা হয়েছে। জগদ্বাসী ইসলাম ও ইনসাফের ঐ অপরূপ দৃশ্য দর্শনে তার ছায়ার তলে দলে দলে জমায়েত হয়েছে। সেখানে সমতা ও ভ্রাতৃত্বের মহান আদর্শ শুনে নয় বরং তার বাহকদের মধ্যে তার পূর্ণরূপ দেখতে পেয়েছিল, তাই জগদ্বাসী ঐ ধর্মের ছত্রছায়ায় একে অপরের ভাই হয়ে সেখানে খুঁজে পেয়েছে শান্তির মূল উৎস, উঁচু-নিচু আশরাফ-আতরাফের বাঁধ ভেঙ্গে এক মুসলিম অপর মুসলিমের হিতাকাঙ্খী ও ভাই স্বরূপ একে অপরকে আলিঙ্গন করেছে। ভুলে গেছে পূর্বের সব শত্রুতা, আশরাফ-আতরাফের ও ছোট-বড় মনোভাবের দূরত্ব। তাই সকলে হয়েছে একই কাতারের বান্দা এবং একই বাহিনীর সৈনিক।

খৃষ্টানদের বহু এলাকাবাসী স্বগোত্রীয় রাজ্যের অধীন থাকার চেয়ে এ সমস্ত পবিত্র আত্মার শাসকদের সুশীতল ছায়ায় থাকার কামনা করতো। এমনকি একবার আবূ 'উবাইদাহ্ (রাযি.) কতিপয় বিজিত এলাকার খৃষ্টান প্রজাদের ডেকে বললেন, আমরা খৃষ্টান রাজ হেরাকলের উস্কানীর কারণে তার মোকাবিলায় বড় অভিযানে যাচ্ছি। এ সময় আমরা তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালনে যথাযথ সমর্থবান হব না। সুতরাং তোমাদের প্রদত্ত ট্যাক্স তোমরা ফেরত নাও। আহ্! কি বিচার আর তখন ঐ এলাকার খৃষ্টানগণ ঐ কথা জেনেও যে মুসলিমরা তাদেরই স্বজাতীয় শক্তির মোকাবিলায় যুদ্ধে যাচ্ছেন তবু তারা এই আবেদন করতে লাগালো ঃ

আমরা আমাদের দেয়া অর্থ ফিরিয়ে নেব না। স্রষ্টার নিকট কামনা করবো আপনারা যুদ্ধে জয়ী হন। আপনাদের ন্যায়পরাণয়তা ও সুবিচারে আমরা যে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে পারছি–যা আমাদের স্বজাতীয় শাসনামলে ছিল না। কাজেই আমরা এতটুকু মনে করে অভয় পাব যে, আমরা আপনাদের প্রজা।

আহ্! এটা ছিল মুসলিম জাতি তথা ইসলামের সত্যিকার জীবন ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনৈতিক সুষ্ঠু ব্যবস্থার যে কারণে বিজাতীয়রাও তাদের রাজ্যে থাকা নিজেদেরকে ধন্য মনে করতো। স্বজাতির বিরুদ্ধে মুসলিমদের জন্য সহানুভূতি প্রদর্শন করা নিজেদের নিরাপত্তার উৎস মনে করতে পেরেছিল। আর তা সম্ভব হয়েছিল একমাত্র ইসলামী জীবন-যাপনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

খোলাফায়ে রাশেদার মহান নায়ক

ইসলামী শাসনের প্রথম যুগের অবস্থা ছিল খলীফা স্বয়ং নিজে এবং প্রজাগণ একই ধরনের নীতি মেনে চলতেন। খলীফা তার ভৃত্যসম অধিকারের ভিত্তিতে বাহনে আরোহণ পূর্বক পথ অতিক্রম করতেন। পোষাক-পরিধানে, যানবাহন ব্যবহারে কোনই ব্যবধান প্রদর্শন করা

হত না। কেবল খলীফা আল্লাহ্ ভীরুতায়, জ্ঞানগরিমায়, বিদ্যাবত্তায় ও বিচক্ষণতায়, রাজনীতি প্রজ্ঞায়; দেশ রক্ষা ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় তাঁর দৃষ্টি সর্বোপরি তীক্ষ্ণতায়, গরীব-দুঃখীর দুঃখ মোচনে, অসহায়ের ব্যথার সহানুভূতিতে ও রাত্রি জাগরণে সকলের নিরাপত্তার চিন্তায় সদা জাগ্রত হওয়ায় খলীফা রাজ্যের মধ্যে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হতেন। আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন তাঁদেরকে জান্নাতে সুউচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করুন।

বর্তমান শাসকবর্গ ও তাদের প্রকৃত চিত্র

বর্তমান এ যামানার শাসকবর্গরা চতুরতায়, শঠতায়, সত্যের সাথে অপলাপ করায়, ন্যায়নীতি বিসর্জন দেয়ায়, প্রজাগণের নামে প্রাপ্ত সাহায্য সহানুভূতির অর্থ আত্মসাতের অভিজ্ঞতায় এদের জুড়ি বিরল ও অনন্য। ধর্মহীনতা, কপটতা, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গতায় সত্যই এরা রাজ্যের জনগণের সেরা ব্যক্তি।

তাই এরা ক্ষমতায় আসার চেষ্টায় ও অধিষ্ঠিত থাকার একান্ত বাসনায় সততার বুলি কপচায়, আর ধর্মীয় ভাবধারায় বান ডাকিয়ে জনগণকে ধর্মীয় নীতির বিশ্লেষণ করে। সেখানে ঐ ধর্ম মানার প্রকৃত উদ্দেশ্য হয় না, বরং সেখানে লুকিয়ে ধর্মের আবরণীতে দূর থেকে গদী লাভের আকাঙ্ক্ষা হয়।

নেতা ও নেতৃত্ব এবং তাঁদের মহান আদর্শ

দেশ ও রাজ্য পরিচালনা দুই শ্রেণী ব্যতীত অপর শ্রেণীর দ্বারা সম্ভব হয় না– এক শ্রেণী বংশ পরম্পরায় দেশের শাসনকর্তা রাজপরিবারের যোগ্য সন্তানকে পিতা রাজনৈতিক বিষয়ে জ্ঞান-গর্ভ শিক্ষা প্রদান করে। যা রাজপরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। যেমন ইসলামের পূর্বে পারস্য সম্রাট ও রোম সম্রাটদের সন্তানগণ প্রজা পালনের যে নীতি ও আদর্শ তারা পিতাদের কাছে পেতো। তা পরিবারের লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো।

ঐ গোত্রের কোন সদস্যই শাসিতদের নিকট তা প্রকাশ করত না। তখনকার দিনে সাধারণ প্রজাবর্গ রাজা বা মহারাজা খলীফা বা বাদশাহগণকে আল্লাহর প্রতীক বা ছত্রছায়া মনে করত। এভাবে পৃথিবীতে শান্তি ও সুখী সমাজ চলে আসছিল।

দ্বিতীয় শ্রেণী হল : "সত্যিকারের ধার্মিক ও ঐশীবাণীর পূর্ণ অনুসরণকারী। ইসলামের স্বর্ণ-যুগের ইতিহাসের পাতায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ রাজনৈতিক প্রজ্ঞা অর্জনকারী ঈমানদার শ্রেণী। তাদের ঈমানের জোরে জনগণের উপর অভিভাবকত্ব সহজ হয়। জনগণ ও শাসকদের মধ্যে ঈমানের ভিত্তিতে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সুদৃঢ় হয়ে যায়।"

এ দুই শ্রেণী ছাড়া তৃতীয় শ্রেণী : শাসন প্রণালী কোনদিন জনগণের আনুগত্য লাভ করতে পুরোপুরি সমর্থ হয়নি। কারণ রাতারাতি ভুঁইফোড় দলগুলোর নেতারা ঐরূপ জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হয়েও রাজনৈতিক ক্ষমতা পেলেও তারা ভোটদাতা জনগণের মতই অন্ধ ও অনভিজ্ঞ। তারা সকলেই শ্লোগানের নেতা কিন্তু বাস্তবে রাজনীতির মঞ্চের নেতা নয়।

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেছেন : "হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের অন্যায়-আচরণের ফলে তোমাদের উপরই নিপতিত হবে।"

অতএব সাধারণ ও শাসকবর্গ একে অপরের প্রতি কতকগুলো হক আছে। যেগুলি পূরণ ব্যতীত রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকা সম্ভব নয়। সবচেয়ে বড় হক সকলের জন্য যা করণীয় তা হল।

মহান ও মহীয়ান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন :

﴿وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾

"মহাকালের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।" (সূরা 'আসর)

মানবগোষ্ঠীর সমস্ত শ্রেণীই ক্ষতি ও লোকসানে নিপতিত। কিন্তু কেবলমাত্র যারা ঈমানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত থেকে সৎ কাজ করে এবং একে অপরকে হকপথে প্রতিষ্ঠিত থাকতে এবং হকনীতি অবলম্বনে যে কষ্ট ও মনের সাথে সংগ্রাম করতে হয় ঐ সংগ্রামে ধৈর্য ধারণের জন্য যারা একে অপরকে ওয়াসিয়্যাত করতে থাকে। ফলে জনসাধারণ ও নেতৃবর্গ তাদের পরস্পর পরস্পরের প্রতি উপদেশ প্রদান করে।

তাই মানবতার মূর্তপ্রতীক রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : **"শ্রেষ্ঠ ঈমান হল নম্রতাসুলভ ব্যবহার ও ধৈর্যধারণ করা।"**

আর এটা ঐ সময় সম্ভব যখন দেশের নেতৃত্ব ঈমানদার আল্লাহভীরু ব্যক্তিবর্গের হাতে অর্পিত হবে। রাজ্যের দায়িত্বপূর্ণ পদে নিরপেক্ষ সৎ ঈমানদার লোকজন দ্বারা অলঙ্কৃত থাকবে। রাজ্যের কর্ণধার ও দেশের গণ্যমান্য সকলেই তাদের ধর্মীয় নীতি, সমাজ নীতি ও রাষ্ট্রীয় নীতি 'সুন্নাহর' আলোকে নীতিসমূহ গৃহীত হবে এবং যা সুন্নাহর দাড়ি পাল্লায় ওজন করতে পারবে। আর তখনই তাদের হারানো গৌরব পুনঃরুদ্ধার করতে সক্ষম হবে।

এরপর নেতাগণ ও প্রজাগণ আল্লাহর দরবারে নতজানু হয়ে তাঁর সন্তুষ্টিমূলক জীবন যাপনের জন্য প্রার্থনা করতে পারে। তবেই তারা রাষ্ট্রীয় জীবনে কৃতকার্য ও পূর্ণ সফলতা অর্জন করবে। অতএব পার্থিব জীবনে বাহ্যিক আড়ম্বর পরিহার করতঃ পারলৌকিক জীবন সুন্দর করার জন্য নিজের দীন ও ধর্মকে সুন্দর করা ছাড়া জাতির কল্যাণ কোন দিনই আসবে না। পূর্ব যুগের মুসলিমগণ যে নিয়মে সংশোধন হয়েছিলেন। আর এটা ছাড়া উম্মাতের পরবর্তীগণের কোনরূপ সংশোধনী বা পবিত্রতা ফিরে আসবে না।

আমাদের কর্ম যেমন তেমনই প্রতিদান

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) রাষ্ট্রনীতি ও ইসলামী শাসনতন্ত্রে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মূল্যবান তথ্য উদ্‌ঘাটন ও

লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি এ বিষয়ে অত্যন্ত মূল্যবান তথ্য সংযোজন করেছেন :

নেতা ও জনসাধারণদের ক্রটির জন্যই হয় না। বরং প্রজাগণ ও নেতা উভয়েরই ক্রটির জন্য এটা সংঘটিত হয়। যেহেতু হাদীসে ঐরূপ উদ্ধৃত আছে যে, "যেমন তোমরা হবে ঐরূপ তোমাদের নেতা দেয়া হবে"।

যুল্ম-অন্যায়-অত্যাচার যেমন শাসক ও ক্ষমতা প্রাপ্তদের পক্ষ হতে প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রকট। অনুরূপ প্রজাদের পক্ষ হতে বাড়াবাড়ি অবাস্তব দাবী-দাওয়া উত্থাপনে বিশৃঙ্খলতা ও শান্তি ভঙ্গ হওয়ার যথেষ্ট কারণ ও আশঙ্কা আছে। তখন আল্লাহর নিকট উভয় শ্রেণীই দোষী ও যালিম বলে সাব্যস্ত হয়ে যায়। সেই সঙ্গে সৃষ্টিকর্তার 'গযব' অবতীর্ণ হওয়ার সময় আসন্ন হয়। স্বাধীনতা ও সুখ-সুবিধা ধ্বংস হয়ে যায়।

যেমন আল্লাহ বলেছেন : "আমি তোমাদের পূর্ববর্তী লোকজনদের ধ্বংস করে দিয়েছি। যখন তারা যুল্ম করল।"

মনীষী শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) বলেছেন : "আয়াতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, যুল্ম করার কারণে রাজত্বে নিজেদের প্রভাব নষ্ট হয়ে যায়। যুল্ম হল অন্যায় আচরণ ও বাড়াবাড়ি নীতি অবলম্বন করা। অপরের প্রতি আক্রমণমূলক কথা ও আচরণ।" এর পরিণাম হয় যে, শাসকশ্রেণীর যে কেউই হোক অথবা জনসাধারণ যারাই অপরের প্রতি বাড়াবাড়ি করবে। সেই ফল বা পরিণাম তাদের উপরেই অর্পিত হবে।

"প্রকৃতপক্ষে সত্যিকারের স্বাধীনতা তারই নাম; যা রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি ও জনগণের কল্যাণকর ভাবধারায় হয়। আল্লাহর প্রতি ঈমান আর নিজ রাজ্য তথা সমগ্র পৃথিবীর উপর আল্লাহর সর্বময় কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিয়ে দেশ পরিচালনা করা হয়। সে স্থলে আসে না পরস্পরের উপর প্রাধান্য বিস্তারের উদগ্র নেশা। আর নেতাগণ সত্যিকারের ধার্মিক হলে তাদের জন্য প্রকৃত ঈমানের জোরে অভিভাবকত্ব সহজতর

হয়। ফলে জনগণ আনুগত্য সহকারে শান্তি ও তৃপ্তি সহকারে জীবন যাপন করার পথ পায়।"

অতএব একমাত্র সর্বসম্মতিক্রমে যা মানা শাসনতন্ত্র ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতাপ্রাপ্ত নেতার অনুসরণই হল সকল দেশের জন্য সকল শ্রেণীর উত্তম শাসন ব্যবস্থা। যিনি হলেন সকল মানুষের পক্ষে জীবনের বিভিন্নাংশের দায়িত্বশীল ব্যক্তি। সর্বপ্রকার আদর্শের মীমাংসা কর্তা ও সর্বময় ক্ষমতা যার হাতে ঐ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নেতার নেতৃত্বের পূর্ণ আনুগত্যতা স্বীকার করতঃ তাঁর শাসন ব্যবস্থা সর্বান্তঃকরণে মেনে নেয়া ছাড়া আর কোন সত্যতাই টিকে থাকতে পারে না। পৃথিবীর সকল যুগের যাবতীয় স্তরে মানুষের জন্য কল্যাণের মূল প্রতীক হচ্ছেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ আর ঐ শাসনতন্ত্র হচ্ছে একমাত্র তাঁরই জীবনাদর্শ।

অতএব মুসলিম বিশ্ব যদি বিভিন্ন দল ও নেতার চিন্তাধারা বর্জন করার পর রাসূলের জীবন ব্যবস্থাকে গ্রহণ করে। তবে ধর্মীয় মতভেদ, রাজনৈতিক বিভেদ সমাজ ব্যবস্থার কন্দোল, বিভিন্ন যুক্তি তর্কের অনৈক্যতা ও প্রতিদ্বন্দ্বীতার অবসান হবে। মুসলিম জাহানে পরস্পর ভাই ভাই সূত্রে একত্র আবদ্ধ হবে। আশা করা যায় অতি অল্প সময় ও পরিশ্রমকে কেন্দ্র করে বিশ্বের সমস্ত উম্মাত এক কাতারে সমবেত হতে পারবে। এক আল্লাহ, এক কুরআন, এক নেতা, এক জাতি, এক নাবীর, এক উম্মাত হিসেবে পৃথিবীতে আবার পুনঃশান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।

শী'আ মতবাদের মূল উৎস ইয়াহূদ সম্প্রদায় হতে আগত

মাদীনা হতে বিতাড়িত ইয়াহূদগণ খায়বারে অবস্থান করতে থাকে, যেমন মাদীনায় থাকাকালে রিসালাতে মুহাম্মাদীয়া ও উম্মাতে মুসলিমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতো, অনুরূপ তারা খায়বারে অবস্থানকালেও ষড়যন্ত্র-কারসাজীতে লিপ্ত হয়, মিথ্যা কথা বলা, শঠতা ও সত্যকে ধামাচাপা দেয়া, ঐশী শিক্ষার বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারিতার কারণে নাবীগণের শিক্ষা-দীক্ষা পরিহার করা ইয়াহূদীদের জাত-স্বভাব ছিল, যার কারণে এদের হাত হতে

কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নিয়ে রাব্বুল 'আলামীন ঈসা ('আ.)-এর অনুসারীদের হাতে দেন। ইয়াহূদগণ খলীফা উমার (রাযি.)-এর খেলাফত আমলে তাদের ঐ দুষ্টামীর জন্য খায়বার হতে বিতাড়িত হয়ে 'আরীহা' নামক স্থানে (সিরিয়া রাজ্যের এলাকা) খৃষ্টানদের রাজ্যে বসবাস করতে থাকে এবং মুহাম্মাদী ঝান্ডা যখন পারস্য ও সিরিয়ার আকাশে উড়তে থাকলো তখন হতে ইয়াহূদদের কতিপয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুচক্রীরা ইসলামী রাজ্যে ইসলামী ভাবভাষা নিয়ে অনুপ্রবেশ করে এবং মুসলিমদের রাজনৈতিক গন্ডগোলের অবসরে মুসলিমদের মধ্যে থেকে এমনভাবে কথা প্রকাশ করতে থাকে যে, তারাই যেন জাতির প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী ও মঙ্গলপ্রার্থী।

এভাবে যুগে যুগে মুসলিম রাজ্যে তাদের আপোষের মধ্যে যখনই গোলযোগ শুরু হয়েছে তখনই তাদের শত্রুরা মিত্র বেশে তাদের এক দলের সাথে মিলেমিশে গণ্ডগোলের হাওয়ায় ফুঁক দিয়েছে, আর ঐ সাথে মুসলিমদের ধর্মীয় 'আকীদা বিশ্বাস, 'আমল-আখলাক বিগড়িয়ে তাদের অকেজো করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। কারণ ইসলামের শত্রুরা জানে যে, **ইসলামের সঠিক আদর্শে মুসলিম জাতি যতদিন প্রতিষ্ঠিত থাকবে ততদিন তাদের কোন ক্ষতি করা যাবে না।** তাই তারা প্রথমতঃ মুসলিমদের 'আকীদার সাথে সাথে ইসলামের অনুশাসন বিনষ্ট করার জন্য সূক্ষ্ম নীতি অবলম্বন করেছে। কিন্তু এটা শত্রুর বেশে সম্ভব নয়, তাই মিত্রের পোশাকে রাজ্যের মালিকানাধিকার নিয়ে সুযোগ মতো এ আন্দোলন পরিচালনা করতো। 'আলী (রাযি.) তাঁর বংশধরদের ফাযীলাত সম্পর্কে রাসূল ﷺ-এর নামে অগণিত জাল কথা হাদীসের নামে সমাজে প্রকাশ করে, বিশেষ করে 'আলী ও তার পরিবারের কাছে পৃথকভাবে গোপন ইল্‌ম থাকার কথা সর্বত্র প্রচার করে এবং 'আলীর বংশগণই খিলাফত ও রাজত্বের মালিক এ কথা নিয়ে তীব্র আওয়াজ তোলে। কিন্তু হুসাইন (রাযি.)-এর কারবালার ঘটনার পর তাঁর বংশধরের জ্ঞানীগণ ঐ কথায় কর্ণপাত করেন না।

শী'আ নীতির মিশ্রণে ইয়াহূদ ও নাসারাদের হতে আগত বহু কথা মাযহাবের নামে স্থান পেয়ে যায়। তন্মধ্যে এরজা ও হীলার মাসআলা। সাবায়ী গ্রুপের সদস্য আবূ হাশিম 'আবদুল্লাহ নামক ব্যক্তি [মৃত্যু ৯৮ হিঃ] এরজার মাসআলা সম্পর্কে একখানি বই লিখে যা কুফার কতিপয় লোকের মধ্যে চালু হয়ে যায়। তাতে 'আমলের দিক দিয়ে জাতি প্রায় পঙ্গু হয়ে যায়। [সিয়ারে আ'লামুন নুবালা **ইমাম যাহাবী** (রহ.) ৪র্থ খণ্ডঃ-২৯-৩০ পৃষ্ঠা।]

সাবায়ী মিশন ও তাদের তৎপরতা

ঐ সাবায়ী মিশনের অন্যতম সদস্য বিশর ইবনে গিয়াস মারিসী। খলীফা হারুন রশীদের আমলে ইসলাম গ্রহণ করে। তার পিতা গিয়াস ইয়াহূদী পণ্ডিত ছিল। সে ইয়াহূদীদের তাওরাতের মধ্যে রদবদল করে। ইয়াহূদ জাতির অবশিষ্ট দীন 'আকীদা বিনষ্ট করে। সাবায়ী মিশনের সদস্যরা সব সময় মুসলিমদের রাষ্ট্রীয় গোলযোগের মুহূর্তে সুযোগ খুঁজেছে এবং যুগে যুগে ইসলামী রাষ্ট্রের শত্রুরা ঐ নিয়মে মুসলিমদের মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত করার ষড়যন্ত্র ও কুট চাল চেলেছে। হারুন-অর-রশীদের দুই পুত্র আমীন ও মামুনের দ্বন্দ্বকালে ঐ গ্রুপ মামুনের দলে ভীড়ে যায়। ফলে মামুনকে শী'আ নীতির প্রতি আকৃষ্ট করে। আর ঐ সাথে ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের এক শ্রেণী যারা মূসা ('আ.)-এর দীন বাতিল করার জন্য তাওরাতকে মাখলুক বলে উল্লেখ করতো, তাদের ঐ নীতি মোতাবিক এই গ্রুপ আল্লাহর কালাম কুরআনকে মাখলুক বলে প্রচার করল এবং মামুনকেও ঐ কথার প্রতি প্রলুব্ধ করল। যাতে আসমানী দীনই বাতিল হয়ে যায়। এছাড়া এই বিষয়ে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের সাত আসমানের উপর 'আর্শের অবস্থান করা অস্বীকার করতো; ভারতীয় সর্বেশ্বরবাদ 'আকীদার ভিত্তিতে সে কথা বলত। কিয়ামাত দিবসে নেকী বদীর ওজন হওয়ার কথা, কবরে মুনকীর নাকীর, সওয়াল-জওয়াব হওয়ার কথা সবই অস্বীকার করতো এবং রাসূলের হাদীস ও সাহাবাগণের উক্তি ইয়াহূদী নীতির ভিত্তিতে উপহাস করত।

মুতাযিলা সম্প্রদায়ের অপতৎপরতা

হুসাইন ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে 'আবদুল্লাহ আন্ নাজ্জার (মৃত্যু ২২০ হিঃ) মুতাযিলা গ্রুপের নেতা ছিল। মুতাযিলাদের চিন্তাধারা ইয়াহূদ সম্প্রদায় হতে আগত। এরা অধিকাংশ হানাফী মাযহাবভুক্ত বলে গণ্য হতো। আবূ হানীফার ফিকাহ্ ও মাযহাব যারা দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করে সুসজ্জিত করেছিলেন তাদের মধ্যে উক্ত বিশর ইবনে গিয়াসকে একজন অগ্রগণ্য ফকীহ বলে হানাফী জীবনীকাররা উল্লেখ করেছেন। আল মুওয়াফফাক ইবনে আহমাদ আলমাক্কী (৪৮৪-৫৬৮ হিঃ) এর কিতাব 'মানাকেবে আবূ হানীফা' নামে ভারতে হায়দ্রাবাদে 'মানাকেবে কুর্দ্দী' নামক কিতাব সহ ১৩২১ হিজরীতে মুদ্রিত হয়। তার দ্বিতীয় খণ্ড ১৩২-৩৩ পৃষ্ঠায় উক্ত বিশরকে অগ্রগণ্য ফকীহ বলে উল্লেখ আছে।

অনুরূপ মুতাযিলা গ্রুপের নেতা 'উবাইদুল্লাহ ইবনে হুসাইন ইবনে দাল্লাল আবুল হাসান আল-কারখী (২৬৪-৩৪০ হিঃ) ইমাম আবূ হানীফার পৌত্র ইসমাইল-এর ভক্ত ও সাগরেদ আবূ সাঈদ বারদাঈর শিষ্য, এ ব্যক্তি হানাফী মাযহাবের এক বড় নেতা বলে গণ্য। এ কারখীর জীবনী 'তাবাকা-তুল মুতাযিলা' কিতাবে উল্লেখ আছে বলে ইমাম যাহাবী 'সিয়ারে আলামুন নুবালা' কিতাবে উল্লেখ করেছেন :

ঐ ব্যক্তি মুতাযিলা দলের বড় নেতা। ঐ কারখী ইয়াহূদী নীতির বাস্তবায়নে রাসূল ﷺ-এর হাদীস অস্বীকার করার জন্য বলেছেন যে, যদি কুরআনের আয়াত বা রাসূলের হাদীস হানাফী মাযহাবের বিপরীত প্রমাণিত হয় তবে তার অর্থ তাভীল করা হবে অর্থাৎ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এমনভাবে করা হবে যাতে মাযহাবের সাথে খাপ খাওয়ানো যায়, আর যদি কোনরূপ খাপ খাওয়ানো না যায়। তবে বলা হবে তার সনদ যঈফ আর যদি য'ঈফ বলার পথ না পাওয়া যায় তবে বলতে হবে তা মানসুখ হয়ে গেছে– (অসূলে কারখী অসূলে বাযদাভীসহ মুদ্রিত ছাপা করাচী নূর মোহাম্মদ প্রেস ৩৭৩-৭৫ পৃষ্ঠা)। এভাবে ইয়াহূদী নীতি মাযহাবের নামে উম্মাতে মুসলিমার মধ্যে আমদানী হয়েছে। ফলে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলো হতে বঞ্চিত হয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে।

ইয়াহূদী ও খৃষ্টান নীতিমালার রূপরেখা

উপরোক্ত সম্প্রদায় তাওরাতের এবং মূসা ('আ.)-এর শিক্ষার বিপরীত বিধি ও আইন কানূন ব্যবস্থা প্রণয়ন করে উহাই আল্লাহর বিধান বলে সমাজে প্রচার করতো এবং সমাজের জনসাধারণ ঐ বিদ্বানদের তাকলীদ করে তা-ই মেনে নিত। অনুরূপ খৃষ্টান সমাজও তাদের বড়দের জন্য শরী'আত রদবদল এবং তদস্থলে নতুন নীতি প্রণয়ন বৈধ মনে করত। এজন্য তাদের শরী'আত বা সমাজ ব্যবস্থায় বিদ'আত নীতির সংমিশ্রণ অধিক মাত্রায় হয়ে যায়, যার প্রতি আল্লাহর কিতাব নাযিল হয়নি বা কোনও নাবীও ঐ নিয়ম বর্ণনা করেননি।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ্ (রহ.) এ ধর্মে আহলে কিতাব, বিশেষ করে ইয়াহূদী জগতের নীতি নিম্নের ভাষায় উল্লেখ করেছেন, যার সারমর্ম উল্লিখিত মন্তব্য :

وهم يجوزون لا كابر اهل العلم والدين ان يغيروا ما رأوه من الشرائع ويضعوا شرعًا جديداً فلهذا كان اكثرشر عهم مبتدعا لم ينزل به كتاب ولا شرعه نبي (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الاسلام صـ ١٦ جـ ٢.

ইয়াহূদীরা আইন বিচার নীতির ক্ষেত্রে বিশেষ অবস্থায় ভক্তদের সুবিধা মুতাবিক ইসতিহ্সান নামক অভিনব নীতির আবিষ্কার করেছিল, যা পরবর্তী যুগে মাযহাবধারীদের মধ্যে কতিপয় মহলেও স্থান পেয়ে গেল। ফলে ইয়াহূদী নীতির আমদানী মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরে ইসতিহ্সান নামক আইন প্রণয়নের মাধ্যম এসে গেল এবং ইয়াহূদী সমাজের ন্যায় উম্মাতে মুসলিমার মধ্যে আলেমদের মনগড়া কথা শরী'আত বলে প্রচারিত হয়ে ইসলামের চেহারা মলিন হতে আরম্ভ করল।

ভারতগুরু শাইখ শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) "আল ফাওযুল কাবীরে" ইয়াহূদদের আলোচনায় বলেছেন :

الاستحسان يعنى استنباط بعض الاحكام لادراك المصلحة فيه ..... فالحقوا أتباعه بالاصل وكانوا يزعمون اتفاق سلفهم من الحجج القاطعة.

তারা বিচার বিভাগে জনস্বার্থের উপযোগী যুক্তি পরামর্শগুলো শরী'আতী আইন বিচাররূপে বানিয়ে নিল এবং ঐগুলো মূল শরী'আতী বিচারের সাথে মিলিয়ে দিল। তারা তাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গদের শরী'আতের বিপরীত ঐকমত্যকে অকাট্য প্রমাণ বলে ধারণা করে বসল।

নাসারাদের গোমরাহীর মূলে ইয়াহূদী চক্রান্ত

পোলিশ, আরাবীতে বৌলীশ নামক এক ইয়াহূদী সন্তান, যার জন্ম খৃস্টাব্দের ৩৫ সনে 'তারাসুস' নামক স্থানে। এ লোকটা খুবই মেধাবী ছিল। ইয়াহূদরা হীলা বাহানার নীতি তালকীন (অনুসরণ) করে। বায়তুল মাকদিসে পড়াশুনা করার পর ইয়াহূদীদের হীলা বাহানার রীতিনীতিতে পাকাপোক্ত হয়ে খৃষ্টানীদের পথভ্রষ্ট করার জন্য তাকে প্রেরণ করা হয় দেমাস্ক নগরীতে। এর পূর্ব নাম ছিল শাওল। পথিমধ্যে চলতে চলতে সে এক ফন্দি রচনা করলো। সে বলল : আমি ঈসা মসীহের ঘোর শত্রু ছিলাম, পথিমধ্যে আকাশ হতে মেঘের ভিতর থেকে এক জ্যোতির্ময় আলোকরশ্মি আমার উপর বিচ্ছুরিত হতে থাকে এবং ঐ আলোক রশ্মি হতে শব্দ আসতে থাকে 'শাওল' 'শাওল' বলে। আমি তখন ভীত হয়ে আরয করলাম : হে প্রভু! আপনি কে বলছেন? তখন ঐ জ্যোতি হতে আওয়াজ এলো : 'আমি স্বয়ং 'ঈসা মসীহ, যার দীনের বিরোধিতার জন্য তুমি চেষ্টায় নিমগ্ন আছ।' সঙ্গে সঙ্গে আমি অন্ধ হয়ে যাই, চোখের জ্যোতি হারিয়ে ফেলি। তখন আমি অনুনয় বিনয় করে বললাম : "আমি আর খৃষ্টান ধর্মের বিরোধিতায় আদৌ চেষ্টা করবো না। আমি নাসারা দীনের শত্রুতা হতে তাওবা করছি। আমি এখন আপনার দীন ধর্মের পরম ভক্ত মিত্রদের অন্তর্ভুক্ত হলাম"– (আল মাউসু আতুল আরাবিয়া)। এরূপ বাহানামূলক কথায় খৃষ্টানরা মনে করলো যে, এ লোকটিকে স্বয়ং মসীহ

ঈসা ('আ.) খৃষ্টান বানিয়েছেন এবং বহু গোপন রহস্য দান করেছেন। ঐসব ভেদ তত্ত্ব ইলহাম সূত্রে প্রাপ্ত। তাই তখনকার খৃষ্টানরা মসীহ ('আ.) এর যে বারো জন হাওয়ারী ছিলেন তাদের উপর শাওল পোলিশকে স্থান দিল। কেননা ঐসব হাওয়ারীগণ তাওরাতের প্রকৃত 'আলিম ছিলেন না।

শাওল ছিল শিক্ষিত তাওরাতের পণ্ডিত। পাণ্ডিত্যের ভিত্তিতে সাধারণ সমাজে অনেক নাসীহাত ও নাবী রাসূলগণের কাহিনী সে মানুষকে শোনাত। এতে তখনকার নাসারা সমাজ তার একান্ত ভক্ত হয়ে যায়। ঐ সময় সে প্রকাশ করল যে, ইয়াহূদরা, নাসারা এবং স্বয়ং ঈসা ('আ.)-এর ঘোর শত্রু। সুতরাং তাদের কিতাব তাওরাতে যে হালাল হারামের বিধি নিষেধ আছে তা নাসারাদের জন্য পালনীয় নয় অর্থাৎ শরী'আত এক অভিশাপ যা ইয়াহূদদের উপর কড়াকড়িমূলক ব্যবস্থা, সেটা নাসারাদের জন্য আদৌ প্রযোজ্য নয়। নাসারা ধর্মের মূল হলো প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা, উদারতা। নাসারাদের উপর স্রষ্টার করুণা হেতু তাওরাতের শরী'আত কড়াকড়ি বিধি নিষেধ রহিত করে দিয়েছেন।

হালাল হারামের বিধি পালনের বাধ্যবাধকতা নাসারাদের উপর নেই। তার উপর স্বয়ং ঈসা মসীহ আল্লাহর পুত্র হিসাবে নাসারাদের সমস্ত পাপ মোচন করে দিয়েছেন। নাসারাদের প্রতি দয়া প্রেমের কারণে তিনি তার পুত্র দিয়ে মসীহের ভক্তদের সমস্ত গুনাহ মার্জনা করার ব্যবস্থা করেছেন। সুতরাং তাওরাতে শরী'আতে অভিশপ্ত ইয়াহূদদের শায়েস্তা করার যে বিধান দেয়া হয়েছিল তা মেনে চলা নাসারাদের কর্তব্য নয়। কেননা শরী'আত মানা অধ্যায় পূর্বে ছিল, এখন তা মানসুখ হয়ে গেছে। প্রেম কর, প্রেম দাও, ভক্তিতে ভগবান মিলবে। (দেখুন- 'আল মাউসুআতুল আরাবিয়াহ কিতাব যা দু' হাজার পৃষ্ঠার অধিক, বহু তত্ত্ব সম্বলিত কিতাব)

এদের বক্তব্য হল এই যে, বড় বড় পাদরীরা আল্লাহর খাস অলী, তারা স্বয়ং আল্লাহর অংশবিশেষ। সুতরাং আল্লাহকে পেতে হলে এদের মাধ্যম ধরতে হবে। এদের স্মরণাপন্ন হতে হবে। এদের পক্ষ হতে নিযুক্ত এক শ্রেণীর লোক জনগণকে এদের কারামতি বর্ণনা ও তাদের আধ্যাত্মিক ও গোপন শক্তির অধিকারী হওয়ার কথা প্রচার করতে থাকে। এরা গোপনে

এদের নজর নিয়াজের হিস্‌সা পেতো, যেমন বাংলাদেশের বড় বড় পীরের আস্তানায় ওরশ উপলক্ষে তাদের দালাল খলীফারা তাদের পীরদের জন্য হিসসার ব্যবস্থা করে থাকে। শাসকবর্গরা ঐ সুযোগে ধর্মের ধারক, বাহক পাদরী বাবাদের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন ও মোটা অংকের অর্থের যোগান দিয়ে তাদের পক্ষাবলম্বনের নিগড়ে বেঁধে ফেলেছিল।

ইয়াহূদ ও নাসারাদের অবক্ষয়ের উৎস

ইয়াহূদ ও নাসারাদের অবক্ষয়ের উৎস আসমানী শিক্ষা পরিত্যাগ করা। কেউ ধর্ম মন্ত্রী, কেউ বাবা, কেউ পীর কাশফ ইলহাম ও কারামতির অধিকারী রূপে তারা তাদের দালালগোষ্ঠী কর্তৃক প্রচারিত হতে থাকলো। এভাবে কুচক্রী শাসক মণ্ডলীর দালাল পাদরী বাবারা জনগণ ও সরকারের মাঝখানে মাধ্যম হয়ে সরকারের হাত মজবুত করতে থাকে। **ঐ সাথে ধর্মের আসল রূপ বদলে শাসক গোষ্ঠীর পছন্দমত আইন প্রণয়ন করতে করতে আসমানী শিক্ষার প্রকৃত রূপ পাল্টে দিয়েছিল। নিজেদের কপোলকল্পিত বক্তব্যগুলি ধর্মের নামে প্রচার করা আরম্ভ করলো, যাতে জনসাধারণ বুঝতে না পারে যে, মূল দীন কোন বিষয়।** ঐ সাথে সাথে পাদরী বাবাদের দালালেরা জনগণকে বুঝাতে থাকে যে, পাদরী বাবারাই স্বর্গের মালিক। আখিরাতের বৈতরণী পার হতে হলে এদের সেবা যত্ন ও নজর নিয়াজ দিয়ে কল্যাণ ও নাজাতের পথ অবলম্বন কর। ফলে জনগণ 'আমলী ক্ষেতকে অনাবাদী করতঃ পাদরী বাবাদের করুণার প্রার্থী হলো। তারাও সুযোগ বুঝে জনগণের পারলৌকিক জীবনের অধিকারী রূপে আস্তানা গেড়ে বসলো। জনগণও ধর্মীয় নেতাদের স্রষ্টার আসনে বসিয়ে দিল। এভাবে তাদের সমাজের বাবা ও পীর গুরুপরা যেন ভাল মন্দের অধিকারী এ পর্যায়ে স্থান পেয়ে গেল। তারা নিত্য নতুন ভেদ তত্ত্বের নামে ভক্তদের জন্য আইন নীতি ও তরীকা আবিষ্কার করতঃ যেটুকু অবশিষ্ট আসমানী শরী'আত ছিল তা সমস্তই বিদ'আতে পরিপূর্ণ করে দিলো। কুরআনে এদের সম্পর্কে ঘোষিত হলো :

﴿اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ﴾

"আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনকে ছেড়ে তাদের ফকীহ ও দরবেশগণকেই মা'বুদ স্বরূপ বানিয়ে নিল।" (সূরা তাওবাহ্ ৯ : ৩১)

অর্থাৎ তারা যা হালাল, বৈধ বা উত্তম তরীকা বলে প্রচার করত তাই তাদের গ্রহণীয় হয়ে গেল। অথচ আল্লাহ তা'আলার দীন হলো যা তিনি তাঁর অনুমতিক্রমে নাবী ও রাসূলগণকে নির্দেশ দিয়েছেন। এতে নাবী ও রাসূল ব্যতীত কারও কোন অধিকার রাখা হয়নি।

এদের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) বলেছেন :

﴾وَالدِّيْنُ الَّذِىْ يَتَقَرَّبُ الْعِبَادُ بِهٖ اِلَى اللّٰهِ لاَ بُدَّ اَنْ يَّكُوْنَ اللّٰهُ اَمَرَ بِهٖ وَشَرَعَهٗ عَلٰى اَلْسِنَةِ رُسُلِهٖ وَاَنْبِيَائِهٖ وَ اِلَّا فَالْبِدَعُ كُلُّهَا ضَلاَلَةٌ﴿

অর্থাৎ যে দীন পালন দ্বারা বান্দাগণ আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে, তার প্রতি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তার নাবী ও রাসূলগণের যবানীতে নির্দেশ দেয়ার প্রমাণ থাকতে হবে, নতুবা তা ধর্মের মধ্যে বিদ'আত বলে প্রমাণিত হওয়ার ও গোমরাহী নীতি বলেই গণ্য হবে। সুফী মহলের যিক্র-আযকারগুলোও শরী'আতে ও তরীকায়ে মুস্তফা ভিত্তিক নয়। বরং এগুলোও ইয়াহূদী নাসারা হতে আগত। উস্তাদ হাকীম শায়খ জাওহার তানতাভী তাঁর তাফসীরে ১৬শ খণ্ডে বলেছেন :

আউলিয়া নামের গ্রুপের খানকা যেগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যার অস্তিত্ব প্রথম যুগে ছিল না, তা হিজরীর প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর পর নাসারাদের তাকলীদী বশতঃ স্থাপিত হয়েছে। অনুরূপভাবে, তারা যে 'ইয়া হু' শব্দে ওযীফা পাঠ করে তাও ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের নীতি হতে আমদানী হয়েছে– (১০১ পৃষ্ঠা)। উক্ত খণ্ডের ১৯০ পৃষ্ঠায় বলেছেন :

উম্মাতে মুসলিমার মধ্যে অন্য জাতির রীতি নীতির অন্ধ অনুকরণের কারণে উম্মাতের অনেকের বিবেক নষ্ট হয়েছে। যেমন পূর্ব যুগের উম্মাতগণ

গলৎ পথের অনুসারী হওয়ায় তাদের ধর্মীয় 'আমলগুলো বেকার বলে পরিগণিত হয় এবং তারা ধ্বংস হয়। পক্ষান্তরে উম্মাতে মুসলিমার প্রথম দুই যুগের অর্থাৎ সাহাবা (রাযি.), তাবি'ঈন, তাবা-তাবি'ঈনগণ বিদেশী ভাবধারা ও আদর্শ সম্পর্কে কচি শিশুর ন্যায় অজ্ঞাত ছিলেন। তারা নুবূওয়াতে মুহাম্মাদীয়ার দুগ্ধ পানে প্রতিপালিত হয়েছিলেন, যার কারণে এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, চীন ও দক্ষিণ ফ্রান্স এলাকাগুলোতে তাদের মাধ্যমে যে ইসলাম পৌঁছায় ঐসব এলাকার লোকগুলো ঐ নুবূওয়াতী দুগ্ধ দ্বারা বাস্তব ক্ষেত্রে খুবই উপকৃত হয়।

وَذٰلِكَ لِأَنَّهُمْ كَانُوا مُحَمَّدِيِّيْنَ.

কেননা সাহাবা (রাযি.), তাবি'ঈনগণ মুহাম্মাদী ছিলেন। তারপর যখন মুসলিম উম্মাহর পূর্ণ দুই শতাব্দী অতিবাহিত হলো তখন শিশুর ন্যায় মায়ের দুগ্ধপানের সময়কাল পার হয়ে শিশুরা যেমন বিভিন্ন খোরাক খেতে অভ্যস্ত হয়, অনুরূপ বিভিন্ন জাতির আদর্শ তাদের সামনে উপস্থিত হলে তারাও মাতা-পিতাহীন ইয়াতীম বাচ্চার ন্যায় হয়ে গেল এবং ইরানী, তুর্কী সভ্যতা ও কালচার তাদের মধ্যে ধীরে ধীরে স্থান পেলো। ইয়াতীম বাচ্চাদের অভিভাকগণ সঠিকভাবে তাদের তদারকী না করলে যেমন নষ্ট হয়ে যায় অনুরূপ তারাও তেমনি গলদ পরিবেশে নষ্ট হয়। কারণ ঐ সময় তারা বিভিন্ন প্রলোভনীয় বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। ফলে উম্মাত অনুরূপ মিথ্যা কথা ও ধোঁকা দাতাদের বানানো সূত্রগুলোর ফাঁদে পড়ে গেল। ঐ সময় তাদের সামনে যা আসমানী দীন প্রকৃত মুহাম্মাদী সুন্নাত দুগ্ধ হিসেবে তারা পেল না এবং ভাল-মন্দের মধ্যে তারতম্য করতঃ ক্ষতিকর খাবার হতেও নিজের জ্ঞান ও বিবেক অনুযায়ী নিজেকে বাঁচাতে পারল না। এভাবে বিভিন্ন খোরাফাত কিংবদন্তী ও গোমরাহীর চক্রে তারা ঘুরতে থাকল।

মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরে ইয়াহূদ নীতি আমদানী

এখানে এ উদ্ধৃতির মূল তথ্য উদঘাটন করা না হলে অনেকেই আলোচ্য বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা বা তার গুরুত্ব আদৌ উপলব্ধি করতে পারবেন না বিধায় বিষয়টি বিস্তারিত লিখে দেয়া হল।

বাংলা একাডেমী, ঢাকা হতে ১৩৮৪ বাংলা মুতাবিক ১৯৭৭ সনে 'মুসলিম আইন' নামক গ্রন্থটি প্রকাশিত, যা জনাব নূরুল মুমিন কর্তৃক লিখিত, যিনি কলিকাতা হাইকোর্টে দশ বৎসর ওকালতি করেছেন, তেইশ বৎসর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন এবং তিন বৎসর বিলেতে গভীরভাবে আইন অধ্যয়ন করেছেন। তিনি উক্ত গ্রন্থের মুসলিম আইনের ইতিহাস বর্ণনায় বলেছেন :

"ইমাম আবূ হানীফা প্রকৃতপক্ষে সুন্নাহ ও হাদীসের চেয়ে নিজস্ব মুক্ত বুদ্ধির বিচারের উপর এতদূর নির্ভর করতেন যে, তিনি মাত্র আঠারটি হাদীস গ্রহণ করেছিলেন"– (মুসলিম আইন, ১৬ পৃষ্ঠা)। তিনি সর্বপ্রথম আইনবিধি সম্প্রসারিত করার জন্য কিয়াস প্রবর্তন করেন এবং এই কিয়াসই হানাফী আইনের বিন্যাস নীতিতে অধিকতর ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে করা হয়। এটা ব্যতীত তিনি আইনের বিচার নীতি হিসেবে ইস্‌তিহ্‌সান-এর প্রবর্তন করেন।

অর্থাৎ যে ইস্‌তিহ্‌সান ইয়াহূদীদের নীতি ছিল তাদের যুক্তি পরামর্শগুলি শরী'আতে আইন বিচার রূপে বানিয়ে নিয়েছিল, তা মাযহাবের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে স্থান পেয়ে গেল।

উক্ত বইয়ে আরও উল্লেখ হয়েছে, ইমাম আবূ হানীফা ইজমার অর্থ অধিকতর ব্যাপক করেন এবং শুধু রাসূলের আসহাবগণের দ্বারা ঐক্যবদ্ধ মতের মধ্যে সীমিত না রেখে প্রতি যুগের আইনবিদগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ঐক্যবদ্ধ মতকেও ইজমা হিসেবে গ্রহণ করেন– (মুসলিম আইন, ১৭ পৃষ্ঠা)। এটাই ছিল ইয়াহূদ ও নাসারাদের নীতি। তাদের বিদ্বানগণের পক্ষ হতে প্রণীত নীতিগুলো অকাট্য দলীলরূপে গ্রহণ করে নেয়া। অথচ তা তাদের নাবী কিংবা নাবীর সাহাবা হতে আদৌ প্রমাণিত নয়।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ্ (রহ.) খৃষ্টানীদের প্রতিবাদে লিখিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থে বলেছেন :

وكذالك عامة شرائعهم التي وضعوها في كتاب القانون .....

وكثير منها مما ابتدعوه ليست منقولة عن احد من الانبياء ومن

الحواريين صـ ١٦١٥ الجزء الثاني، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح.

আল কানূন নামে কিতাবে খৃষ্টানরা যে নীতি নিয়ম নির্ধারণ করেছে তা কিছু সংখ্যক আম্বিয়া ও তাদের আসহাব হতে উদ্ধৃত, আর অধিক সংখ্যক নীতি যা তারা আবিষ্কার করেছে তা কোন নাবীর সাহাবাবর্গ হতে বর্ণিত নয়।

(আল জওয়াবুস্ সাহীহ্ লেমান বাদ্দাল্লা দীনাল মাসীহ, ১৫-১৬ পৃষ্ঠা, ২য় খণ্ড)

মুসলিম আইন প্রণেতা উক্ত গ্রন্থে মুসলিম আইনের ইতিহাস অধ্যায়ে লিখেছেন : "ইমাম শাফি'ঈ হানাফীদের অপেক্ষা হাদীস ও সুন্নাহ্র উপর বেশি নির্ভর করতেন, তিনি হানাফী ইস্তিহ্সানকে শুধু প্রত্যাখ্যানই করেননি; এদের ক্রটিও নির্দেশ করেছেন।" (মুসলিম আইন, ১৯-২১ পৃষ্ঠা)

আহলে হাদীস ও ওয়াহাবীদের আলোচনায় বলেছেন : "তারা ইসলামকে রাসূল ﷺ-এর সুবর্ণ সময়ের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। তাদেরকে গায়ের মুকাল্লিদ বলে ধরা হয়, তারা নিজেদেরকে আহলুল হাদীস বলে আখ্যায়িত করে, তারা রাসূল ﷺ-এর সাহাবীগণের ইজমাই শুধু গ্রহণ করে।"

এ উদ্ধৃতি পেশ করার এটাই মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে আহলে হাদীস নামে একটি মাত্র দল আছে যারা ইসলামকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুবর্ণ সময়ের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চায় এবং ইজমা বলতে সাহাবাগণের ইজমাই কেবল গ্রহণ করে। ইহাই হল ইসলামের অবিকল চেহারা যা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলে গেছেন যে, হিদায়াতের উপর একটি মাত্র দল প্রতিষ্ঠিত থাকবে যারা আমার ও আমার সাহাবাগণের তরীকায় কায়িম থাকবে।

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আমাদেরকেও সে সম্প্রদায়ভুক্ত করুন। আমীন!

ওয়াল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন।